করে, কারণ, তখনি তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই এইটুকু-মাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে' থাক যে, "তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোন স্বাধীন অধিকারপ্রাপ্তির যোগ্য নও।"

কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে,—যে জাত নিরাপদ দেখে' দুর্ব্বলের কাছে "তেরিয়া"—অর্থাৎ তোমরা যাকে বল "বুলি"—যার কোন বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবতঃ আসে কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোন বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু'রকমের আছে—ধর্ম্মতঃ এবং কার্য্যতঃ। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাক্‌লে অনেক কাজই বলপূর্ব্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিকগুণের দ্বারাই সে কার্য্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

তুমি কেবল প্রহারের জোরে পিতার কর্ত্তব্যসাধন করতে পার কিন্তু পিতৃস্নেহ এবং মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতীত ধর্ম্মতঃ পিতৃত্বের অধিকার জন্মে না।

কিন্তু ধর্ম্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না বলে' যে, ধর্ম্মের [illegible] অরাজক তা' বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং [illegible]র ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্চে, একসময় এরা [illegible]ড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব সহকারে সহ্য করে' যাই, প্রতিকারের কোন ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য অনেক ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরাজ একটা জাতই স্বতন্ত্র; কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়; যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সে অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যেই তার রাত্রে ঘুম হয় না। যে সৌভাগ্যবানের দ্বারে অর্গল আছে চোরের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রতি তার তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না—অর্গলটাই তার আশু উপকারে দেখে।

লাথির পরিবর্ত্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্ম্মভয় দেখান যদিচ দেখ্‌তে অতি মনোহর হয় বটে, কিন্তু লাথির পরিবর্ত্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে মাত্র বল সঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতিকথা শোন!

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরাজ প্রভুর নিতান্ত

"পেটার্নাল্ ট্রীট্‌মেণ্ট্"-টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজের পিলে কিরকম অবস্থায় আছে এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তার কোন পরীক্ষাই হয় নি।

আমাদের ভারতবর্ষীয়দের বিশ্বাস, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকেরই পিলে এত অতিশয় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে যে বুটসমেত সজোর লাথি বেশ নিরাপদে সহ্য করতে পারে!

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্চে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাত মৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যেরকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম করে' বলা হয় যে, তোমাদের আমরা মানুষ জ্ঞান করি না। তোমাদের দুটো চারটে যে থামকা আমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে তোমাদের পিলের দোষ! পিলে যদি ঠিক থাক্‌ত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাক্‌তে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।

যা হোক্, ভদ্রনাম ধরে' অসহায়কে অপমান করতে যার সঙ্কোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্ব্বল হলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে' থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝতে পারিনে। ইংলণ্ডে ত তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন তাঁরা সভাসমিতি করে' নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিম্বা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরাজের ঘর থেকে কি একটি মেয়েও আসেন না, যিনি উক্ত বাহুল্য করুণরসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে' মনোভার

কিঞ্চিৎ লাঘব করে' যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার। তিনি ত আমাদের মুরুব্বি ছিলেন না, যথার্থই পিতা ছিলেন। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, বিবাহ করেন, এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে' আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কি অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে' সৃজন করেন নি!——

যাই হোক্, স্বগত উক্তি যত ভালই হোক্ ষ্টেজ্ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশতঃ মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফ্‌ওয়ালা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠ্‌ল চোর তখন পালিয়েচে—তারা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েচে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগ্‌লুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগ্‌চে ভাল। অল্পবয়স, মন খুলে' কথা কয়, কারো সঙ্গে বড় মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট্ করে' বনে' গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অষ্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন—তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলেন "They are not at all smart!" বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরাজমেয়ে দেখা যায় তারা বড়ই

smart—বড্ড চোকমুখের খেলা, বড্ড নাকেঁ মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব—কারো কারো লাগে ভাল, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোট ছোট নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেম্‌নি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্‌রা ধরে' সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে' একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখ্‌তে পেলুম অনেক দিন ইংরাজী গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল ; হঠাৎ এই বাঙ্গলা সুরটা পিপাসার জলের মত বোধ হল। আমি দেখ্‌লুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে' আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মাল্টা দ্বীপে পৌছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন সহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে' নাব্‌তে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল।

সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মত উঠেছে, তারি সোপান বেয়ে সহরের মধ্যে উঠ্‌লুম। অনেকগুলি গাইড্-পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বল্লেন—"চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়সাও দেব না"—তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে' গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বল্লেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোন ইংরাজ হলে এমন করত না!—আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জ্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না। এই জন্যে এক জাতীয়ের পক্ষে আর এক জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, একজন ইংরাজভিক্ষুক এবং একজন ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুক ঠিক এক শ্রেণীর নয়। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তির অগৌরব না থাকাতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা অবলম্বন করে তার আত্মসম্মান দূর হয় না। আমাদের দেশে মানুষের দয়া এবং দানের উপর মানুষের অধিকার আছে; দাতা এবং ভিক্ষুক, গৃহস্থ এবং অতিথির মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধন নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিক্ষার মধ্যে সেই হীনতা নেই। আমাদের মহাদেব ভিখারী। ইংলণ্ডে নিজের ক্ষমতা এবং নিজের পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুর উপরে নির্ভর করা হীনতা, সুতরাং ইংরাজ "বেগর" ঘৃণার পাত্র।

ভিন্ন জাতিকে বিচার করবার সময় তার সমস্ত অতীত

ইতিহাসপরম্পরা যদি হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি তাহলেই আমরা পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু সে সহৃদয়তা কোথায় পাওয়া যায়!

'মাল্টা' সহরটা দেখে' মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠ্‌চে একবার নীচে নাম্‌চে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অতি কদর্য্য। আহারান্তে, সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক্ আছে সেইখানে ব্যাণ্ড্ বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে' আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না—আমাদেরই দোষ! আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি বিষয়বুদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না। এরকম মুখশ্রী দেখ্‌লে অতি বড় সৎলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হোক্ মাল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে' এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনারটেবিলে "স্মাগ্লিং" সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্ত্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেণ্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা যেন কিঞ্চিৎ গৌরবের বিষয় মনে করে। আর যাই হোক্, তেমন নিন্দা বা

লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এম্নি জীব! একজন ব্যারিষ্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পূরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সে জন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না—কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফির দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরাজী করে' বলেন "রাইটিয়াস্ ইণ্ডিগ্নেশন্!" সর্ব্বনাশ!—

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হল। এই বৃষ্টিতে একদল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে' দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে' রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুইধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে' দুটো খালি-পা ইটালিয়ান্ ছোক্‌রা ফিগ্ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা খাবে কি না—আমরা বল্লুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ্-শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ্ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইসারায় তামাক প্রার্থনা করে' বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ চল্‌তে লাগ্‌ল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ

উচ্চ হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে' গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট বাড়ি, জান্‌লার কাছে ফিগ্‌ফল শুকোতে দিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট শাখাপথ বক্রগতিতে এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের দেখ্‌লুম। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোট ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দ্দা দিয়ে ছবি দিয়ে রঙীন্ জিনিষ দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলা-ঘর—এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষী আছে—মৃত্যুটাকে যেন গম্ভীরভাবে নেওয়া হচ্চে না।

গোরস্থানের একজায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খল ভাবে স্তূপাকারে সাজানো রয়েচে। তৈমুরলঙ্গ বিশ্ববিজয় করে' একদিন এইরকম একটা উৎকট কৌতুকদৃশ্য দেখেছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে' বেড়াচ্চে ঐ মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দ্দা ফেলে রেখেছে—কোন নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্ম্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাহলে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে' বসে' শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' বিকট বিদ্রূপের হাস্য করছে। পুরোণো বিষয়! পুরোণো কথা! ঐ নরকপাল অবলম্বন করে' নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেচেন—কিন্তু অনেক-

ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে' আমার কিছুই ভয় হল না! শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর—ঐ গোলাকার অস্থিবুদ্বুদ্গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে! এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে' চীৎকার করে' মরচে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জ্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করচে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোন খোঁজ নিচ্চে না।

যাই হোক্, আপাততঃ আমার এই কপালফলকটার মধ্যে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করচে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুসির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে—ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেচে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাঙ্গলা দেশ, আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্য্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মত আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠ্ছে।

ডেকের উপরে বসে' গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে' দেখ্‌লুম, ছ'ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অৰ্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট্ বোঝাই করে' নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগ্‌ড়ি দেখা যাচ্চে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়চে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে' অনিচ্ছুক উট্‌কে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির একখণ্ড ছবির মত মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্ —কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে' মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক খরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো এ নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, তবু কোন যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেশন করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রখরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই। আমি এর ইতিহাস কিছুমাত্র জানি নে—কিন্তু যে সব রমণী চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে উগ্র উত্তেজনায় জীবনের সমস্ত সহজ-সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীতস্পৃহ হয়েচে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কি শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই

উদগ্র আমোদমদিরার আস্বাদ জানে না—তারা অল্পে অল্পে অতি সহজে স্ত্রী থেকে মা, এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে। পূর্ব্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।

ওদিকে আবার মিস্ অমুক এবং অমুককে দেখ! কুমারী-দ্বয় অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কি খেলাই খেলাচ্চে। আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই,—সচেতন পুত্তলিকা—মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চখে মুখে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর।

২৫ অক্টোবর।—আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে' দরজার সাম্‌নে অপেক্ষা করে' দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-পুঙ্গব অম্লান-বদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে' ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে' পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় বলে' মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লুম, নম্রতা গুণটা খুব ভাল হতে পারে কিন্তু খৃষ্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখ্‌তে অনেকটা ভীরুতার মত। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশি সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয় কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংস-বহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সঙ্কোচজনক মনে হল। স্বার্থপরতা অনেক সময় এই জন্যই জয়লাভ করে—বলিষ্ঠ বলে' নয়—অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিৎ বলে'!

মইনু।

১

তন্ময় হ'য়ে খেলিছে নীরবে
চারি বছরের মেয়ে!
মৃণ্ময় তার ছোট ঘরখানি
ধূলি শাক পাতা লয়ে!
মুগ্ধনয়নে সহোদর কাছে,
বসি সে নেহারে খেলা,
পিতা বসি দূরে, ভাবেতে মগন
মসী-সমরেতে ভোলা!

২

ধূলি অন্ন রাঁধি ডাকি সহোদরে
কহিছে মোহিনী মেয়ে,
"খেতে বোস দাদা, মিছামিছি করে'
জল আসি আমি নিয়ে!"
ক্ষুদ্র গাগরী ধরিয়া কাঁখেতে
আঙ্গিনার পানে ধায়,
শূন্যে পূরিয়া মিছার সলিল
হাসিয়া ফিরিয়া চায়!

৩

দূর যেন কোন বাঁশরীর তান
পিতার শ্রবণে পশে,
বিস্মৃত যেন স্বপনের স্মৃতি
মরমে ফিরিয়া আসে!

"কি বলিলি মাগো জানা আছে তোর
এসব মিছার খেলা,
জেনে শুনে মোরা, ভুলে থাকি যত
বহে' তত যায় বেলা!"

৪

আদরের ডাকে, মইনু হাসিয়ে
ঝাঁপিয়ে কোলেতে ধায়!
স্নেহরাগভরে, বদন চুমিয়ে,
জনক কহিছে তায়।
"মিছা খেলা তোর, মিছা সব যদি
হাসিও কি মিছা তোর!
কন্যারূপিণী জননী আমার,
প্রেমের কোমল ডোর!"

বুড়া ও বুড়ির কথা।

(জাপানের গল্প)

(আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের লোটির "করুণা ও মরণের কথা" নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।)

টোটোসান ও কাকাসান স্বামী ও স্ত্রী। তাহারা অতি, অতি বৃদ্ধ; সকলেই তাহাদের চিরকাল জানিত; এমন কি, নাঙ্গাসাকির প্রাচীনতম অধিবাসীদেরও মনে পড়ে না যে, কখনো তাহাদের যৌবনকাল দেখিয়াছে।

তাহারা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। কাকাসান পক্ষা-

ঘাতগ্রস্ত, টোটোসান অন্ধ; সে একখানি ছোট বাক্স-গাড়িতে তাহার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বেড়াইত।

পূর্ব্বে ইহাদের নাম ছিল হাটোসান ও উমেসান (শ্রীযুক্ত পায়রা ও শ্রীমতী পেয়ারা) কিন্তু সে নাম আর কাহারো মনে ছিল না।

নিপনী ভাষায় টোটো ও কাকা অতি মিষ্ট শব্দ, ছেলেদের মুখে তাহার অর্থ "বাবা ও মা।" তাহাদের বয়সের আধিক্যহেতু সম্ভবতঃ সকলে এই বলিয়া ডাকিত; এবং এই দেশের আত্যন্তিক ভদ্রতাবশতঃ এই দুই ডাক-নামের পর লোকে 'সান' শব্দ বসাইত, তাহার অর্থ সম্মানসূচক, যথা, মহাশয় বা ঠাকুরাণী (বাবামহাশয় ও মাঠাকুরাণী); জাপানী শিশুগণও শিষ্টতার এই সকল নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করে না।

তাহাদের ভিক্ষা করিবার প্রণালী ভদ্রোচিত ও সুসংযত; তাহারা কাতর অনুনয় দ্বারা লোকদের বিরক্ত করিত না, কোন কথা না বলিয়া কেবলমাত্র হস্ত প্রসারণ করিত, সেই লোলচর্ম্ম হস্ত যেন ইহারই মধ্যে ইজিপ্টের সুরক্ষিত মৃতদেহের ন্যায় বলি-রেখাঙ্কিত। তাহারা ভিক্ষাস্বরূপ ভাত, মাছের মুড়া ও উচ্ছিষ্ট ঝোল পাইত।

সকল জাপানী মেয়ের ন্যায় কাকাসান নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি; বহুকাল এই বাক্স-গাড়িতে বসিয়া বসিয়া তাহার শুষ্ক অর্দ্ধমৃত দেহ যেন তাহাতে লীন হইয়া গিয়াছে।

তাহার গাড়িটি চাকার উপর ভালরূপ বসানো হয় নাই; সুতরাং সহর ভ্রমণকালে তাহাকে খুব ঝাঁকানি সহিতে হইত। তবু তাহার বৃদ্ধ স্বামী আস্তে আস্তে কত সাবধানে কত সন্তর্পণে চলিত। কাকাসানের কণ্ঠস্বর অনুসারে চালিত হইয়া টোটো-সান নিবিষ্টচিত্তে কর্ণপাত করিয়া তাহার চির-অন্ধকার পথ

অতিবাহিত করিত; সম্মুখস্থ পথ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার হস্তে বাঁশের লাঠি, স্কন্ধে গাড়ি টানিবার চর্ম্মখণ্ড।

সিঁড়িতে উঠিবার বা কোনরূপ নালানর্দ্দামা পার হইবার আবশ্যক হইলেই বড় গোল বাধিত, কিরূপে টোটোসান এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে? তখন বুড়ি বেচারীর দিকে চাহিয়া দেখ, বাক্সের ভিতরে বসিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কালের দৌরাত্ম্যে যদিও তাহার চক্ষু বাষ্পাবৃত তথাপি বিপদাশঙ্কায় তাহার সেই চক্ষু জ্বলিতেছে, তাহার মুখের ভাব ব্যাকুলতাপূর্ণ। এই পড়িবার ভয়ই যে তাহাকে শেষদশায় অধিকতর ক্ষীণ করিতেছে তাহার সন্দেহ নাই।

এই যে দুই বুড়াবুড়ি পরস্পরকে এত ভালবাসে, ইহাদের মস্তিষ্কমধ্যে না জানি কি ভাবের উদয় হয়? সন্ধ্যাবেলায় নির্জ্জনে বসিয়া দুইজনে কি গল্প করে? রাত্রিকালে যখন কাকাসান মাথায় তাহার নীল রুমাল বাঁধে ও দুইজনে ঘুমাইবার নিমিত্ত কোন আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহারা যৌবনের কোন্ স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলে? আগামী কল্যের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিরূপে তাহারা পরামর্শ করে—সেদিনও ত ঠিক গতকল্যেরই অনুরূপ হইবে, অন্নের জন্য সেই একই চেষ্টা, সেই ভগ্নদশা, সেই দুঃখকষ্ট। তাহাদের কি এখনও কোন সুখ, কোন আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে? তাহাদের কি আজিও চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান? কেন তবে তাহারা বাঁচিতে এত দৃঢ়সঙ্কল্প, যখন পৃথিবী তাহাদের গ্রহণ করিবার জন্য, তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিয়া এই জীবন্মৃত্যুকে প্রকৃত মৃত্যুতে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত?

মন্দিরে সকল ধর্ম্মোৎসবের সময়ে টোটোসান ও কাকাসান উপস্থিত থাকিত।

মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণের বড় বড় কালো সিডার বৃক্ষের ছায়ায় কোন প্রাচীন বিকট প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে তাহারা সকাল সকাল গিয়া বসিয়া থাকিত,—তখনও ভক্তবৃন্দের কেহই আসে নাই। যতক্ষণ পূজা চলিত, অনেক যাত্রী আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইত। পুত্তলী-বদনা বিড়ালনয়না যুবতীগণ তাহাদের উঁচু কাঠের জুতা টানিয়া চলিয়াছে; নিপনী বালক-বালিকা অদ্ভুত বিবিধ বর্ণখচিত লম্বা লম্বা কাপড় পরিয়া, দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া পূজা করিতে আসিয়াছে; কেশবিন্যাসনিপুণা হাবভাবপরিপূর্ণা সুন্দরী রমণীগণ পূজা করিতে ও হাসিতে পাগোডাতে যাইতেছে; দীর্ঘকেশ কৃষক, বৌদ্ধ পুরোহিত বা বণিক, এই ক্ষুদ্রকায় আমোদপ্রিয় জাতির অন্তর্গত সকলপ্রকার পুত্তলিকা কাকাসানের সম্মুখ দিয়া যাইত; এখনো তাহার এ সকল দেখিবার শক্তি ছিল, টোটোসানের সে শক্তি রহিত। সকলেই তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিত, কোন কোন দল হইতে একজন আসিয়া তাহাদের ভিক্ষা দিত; এমন কি অনেকে তাহাদের অভিবাদনও করিত, ঠিক যেন তাহারা খুব উচ্চশ্রেণীর লোক। এই রাজ্যের লোক এতই ভদ্র, এবং এই বৃদ্ধ দম্পতি এমনই সুপরিচিত।

এই সকল দিনে, যখন আকাশ পরিষ্কার ও বাতাস অনতি-শীতল থাকিত, যখন তাহাদের জরাজনিত যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইত, তখন তাহারাও উৎসবের হাসিতে যোগ দিত। কাকাসান চতুর্দ্দিকের আনন্দময় হাস্যধ্বনিতে প্রফুল্ল হইয়া তাহার কাগজের পাখাখানি লইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীদের ন্যায় ভাবভঙ্গী করিত, এমন ভাব ধারণ করিত যেন এখনো তাহার জীবন উপভোগ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে,

যেন এখনো এই পৃথিবীর আমোদে তাহার আমোদ বোধ হয়।

কিন্তু যখন সন্ধ্যার আগমনে বৃক্ষতল অন্ধকার ও শীতল হইত, যখন সেই প্রস্তর-মূর্ত্তিশোভিত সঙ্কীর্ণ পথে ও মন্দিরের আশপাশে যেন সহসা একটা ভীষণ দৈবরহস্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তখন এই বৃদ্ধ স্বামীস্ত্রী নিতান্তই অবসন্ন বোধ করিত। দিবসের শ্রান্তি যেন তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করিয়াছে, তাহাদের বলিরেখা আরও গভীরাঙ্কিত, তাহাদের শুষ্ক চর্ম্ম অধিকতর লোল; তাহাদের মুখে কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং আসন্ন মৃত্যুর কাতরতা বিরাজমান।

তাহাদের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বৃক্ষশাখায় শত শত দীপ প্রজ্বলিত হইল, এবং মন্দিরের সোপানোপরি উপাসকমণ্ডলী সমবেত হইতে লাগিল। একদিকে এই জনতার বিচিত্র ও চঞ্চল আমোদের গুন্‌গুন্ ধ্বনিতে মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও পবিত্র গম্বুজ পূর্ণ, অপরদিকে চিরহাস্যবিকশিত নিশ্চল দেবরক্ষক প্রস্তরমূর্ত্তি, ভীতিজনক ও অজানিত চিহ্নসকল এবং নিশীথের অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা। দীপালোকে উৎসব চলিতে লাগিল, তাহা যেন পূজা না হইয়া আকাশের দেবতাগণের প্রতি একটা প্রকাণ্ড উপহাসের ন্যায় দেখাইতেছিল। কিন্তু সে উপহাসে বিষ নাই, সে উপহাস সরল, উদার ও আনন্দপূর্ণ।

কিন্তু যাহাই হোক, একবার সূর্য্য অস্ত গেলে এই দুই মনুষ্যদেহাবশেষকে আর কিছুই সজীব করিয়া তুলিতে পারিত না; তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ ভয়ঙ্কর দেখিতে হইত, জড়সড় হইয়া রুগ্ন কুকুর বা বৃদ্ধ জীর্ণ বানরের ন্যায় তাহারা একপার্শ্বে পড়িয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নকণা ভক্ষণ করিত। এই সময়ে তাহাদের মৃতপ্রায়

মুখে ওরূপ ব্যাকুল উদ্বিগ্ন ভাব কেন? তাহারা কি কোন গভীর অনন্ত তত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন?—কে বলিবে এই বৃদ্ধ মস্তকের অভ্যন্তরে কি হইতেছে? হয়ত কিছুই নহে! তাহারা কেবলমাত্র প্রাণধারণচেষ্টায় প্রাণপণ যুঝিত, তাহারা পরস্পরকে স্নেহসহকারে সাহায্য করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ভাতের কাঠি দিয়া খাইত; পাছে শীত করে, পাছে হিম লাগে, সেই ভয়ে তাহারা গায়ে কাপড় মুড়ি দিত; পরদিন যাহাতে জীবিত থাকিয়া একজন অপরকে টানিয়া সেই ভ্রমণে বাহির হইতে পারে, এই ইচ্ছায় তাহারা সাধ্যমত আপনার প্রতি যত্ন করিত।

সেই ক্ষুদ্র গাড়িটিতে, শুদ্ধ কাকাসান নহে, তাহাদের গৃহস্থালীর সকল দ্রব্যই থাকিত, ভাত রাখিবার কতকগুলি নীল কাঁচের ভাঙ্গা পিরীচ, কতকগুলি ছোট ছোট চায়ের পেয়ালা, এবং একটি লাল কাগজের লণ্ঠন, সেটি তাহারা সন্ধ্যাবেলায় জ্বালাইত।

সপ্তাহে একবার করিয়া অন্ধ টোটোসান যত্নপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর কেশরঞ্জন ও কবরীবন্ধন করিয়া দিত। জাপানী কেশবিন্যাসে যে পরিমাণে হস্তোত্তোলন আবশ্যক, তাহা কাকাসানের সাধ্যাতীত, সুতরাং টোটোসান শিখিয়া লইয়াছিল। কাকাসান অলসভাবে তাহার স্বামীর নিকট মস্তক সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, টোটোসান তাহা লইয়া কম্পিতহস্তে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া নাড়াচাড়া করিত, ইহা দেখিয়া বানরগণের যোড়ে যোড়ে পরস্পরকে সাজানো মনে পড়িয়া দুঃখ হইত। কাকাসানের চুল অতি অল্প, সেই হলুদবর্ণ কাগজসদৃশ, শীতকুঞ্চিত ফলের মত মস্তকে টোটোসান আঁচড়াইবার বড় বেশি কিছু

পাইত না। তবু সে কোনপ্রকারে অলকগুচ্ছ নির্ম্মাণ করিয়া নিপনী রুচি অনুসারে সাজাইত; কাকাসান আগ্রহসহকারে একটি আরসীতে এই সজ্জার পরিণাম নিরীক্ষণ করিত, "আর একটু উঁচু হইবে, টোটোসান! আর একটু ডানদিকে, আর একটু বাঁদিকে।" অবশেষে যখন টোটোসান দুটি শিংনির্ম্মিত কাঁটা দিয়া এই কবরীর শোভা সম্পূর্ণ করিত, তখন কাকাসানকে আজিও বেশ ভব্যযুক্ত বুড়িটি বোধ হইত, যেন জাপানী ফুল-দানিস্থিত চিত্রের ন্যায় দেখাইত।

তাহারা নিয়মিতরূপে স্নানাদিও করিত—জাপানীরা অতিশয় পরিচ্ছন্ন।

এত বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয় যে স্নানকার্য্য বারম্বার করিয়া আসিতেছে তাহা যখন পুনর্ব্বার সমাপন হইত, মৃত্যুর আসন্নতায় যে বেশবিন্যাসক্রিয়া দিন দিন অধিকতর নিষ্ফল হইতেছে তাহা যখন সমাধা হইত, তখন সেই নির্ম্মল শীতল জলে কি তাহাদের কিছুমাত্র সতেজ বোধ হইত, বিমল প্রভাতে কি তাহারা এখনো কিয়ৎ পরিমাণে জীবনের সুখ অনুভব করিত? কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! প্রতিদিন প্রাতে দুইজনে উঠিয়া আপনাদিগকে নির্জ্জীব-তর রুগ্নতর ক্ষীণতর অনুভব করা, তাহা সত্ত্বেও প্রাণপণে জীবন-ধারণের প্রয়াস, রৌদ্রে আপনার জরাজীর্ণতা বিস্তার, চিরদিন সেই টানাগাড়িতে ভ্রমণ! সেই ধীরগতি, সেই ঘড়ঘড় শব্দ, সেই ঝাঁকানি, সেই শ্রান্তি; চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ানো—পথে পথে, মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে, উৎসবের দিনে সুদূর-পল্লিস্থিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দেবালয়ে।

একদিন সকালে, মাঠের মাঝে, দুটি রাজপথের সন্ধিস্থলে, মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আসিয়া বৃদ্ধা কাকাসানকে আক্রমণ করিল।

সুন্দর বসন্তপ্রভাত, সূর্য্যকিরণপ্লাবিত, পত্রপুষ্পশোভিত।

এই কিউ-সিউ দ্বীপে বসন্তকাল য়ুরোপীয় বসন্ত অপেক্ষা গরম এবং অচিরাগত। ইহারই মধ্যে এই উর্ব্বরা ভূমি সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজপথদ্বয়ের চতুর্দ্দিকস্থ কোমল ধান্যক্ষেত্র মৃদু সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া সবুজ মখমলসম ছায়ালোকে শোভিত। ঝিল্লির গানে আকাশ পূর্ণ। জাপানে এই পতঙ্গের স্বর অতি তীব্র।

এই চৌমাথায় কতকগুলি স্বতন্ত্র উন্নত সিডার-বৃক্ষতলে, ঘাসের মধ্যে দশবারোটি সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে; কতকগুলি কেবলমাত্র চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড, কতকগুলি বুদ্ধদেবের পদ্মাসীন প্রস্তরমূর্ত্তি। ধান্যক্ষেত্রের পরপারে বন দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা য়ুরোপীয় ওক্‌বনের ন্যায়—কিন্তু ইতস্ততঃ যে শাদা বা গোলাপী পুষ্পগুচ্ছ রহিয়াছে সেগুলি ফুটন্ত কামেলিয়া, এবং ঐ অতি সুকুমার পল্লবগুলি বাঁশবৃক্ষের; আরও দূরে ক্ষুদ্র গম্বুজ বা মিনার-আকার পর্ব্বত নীলাকাশের অঙ্গে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক কিন্তু অতি সুশ্রী গঠন চিত্রিত করিয়াছে।

এই শান্তিময় শ্যামল স্থানে কাকাসানের গাড়ি থামিয়াছিল, এবং ইহাই তাহার শেষ বিশ্রাম। কতিপয় কৃষক ও কৃষকপত্নী, পরিধানে ঘননীল লম্বা সূতার পাগোডাকৃতি আস্তিনযুক্ত পোষাক, প্রায় বিশজন ক্ষুদ্রকায় দয়াশীল নিপনী সেই টানাগাড়িটির চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে বৃদ্ধা মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীরভাবে জীর্ণ হস্ত চালনা করিতেছে। টোটোসান তাহাকে তীর্থদর্শনার্থে কানন দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে সহসা এই বিপদ উপস্থিত হইল।

যাহারা কৌতূহল এবং দয়াপরবশ হইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে যত্নবান হইল। তাহার

মধ্যে অধিকাংশ লোকেই এই কানন দেবীর—স্নেহকরুণার অধিষ্ঠাত্রীর—উৎসব দেখিতে যাইতেছিল।

বেচারি কাকাসান! তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আশায় একপ্রকার ধান্যের আরক খাওয়ানো হইল, সুগন্ধ পত্রদ্বারা তাহার গাত্রমর্দ্দন করা হইল, নদীর শীতল জল তাহার স্কন্ধদেশে সিঞ্চন করা হইল।

টোটোসান তাহাকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করিল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। সে কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার অন্ধ হস্তচালনে অন্যদের কার্য্যের ব্যাঘাত করিল, শোকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা সঘনে কাঁপিতে লাগিল।

শেষ চেষ্টাস্বরূপে, বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা লিখিত অব্যর্থ মন্ত্রপূর্ণ কাগজখণ্ডের গুলি পাকাইয়া কাকাসানকে খাওয়ান হইল। একটি হিতৈষিণী রমণী তাহার আপন আস্তিনমধ্য হইতে এই কাগজ বাহির করিয়া দিল।

বৃথা চেষ্টা, কাকাসানের পরমায়ু শেষ হইয়াছিল; মৃত্যু সেখানে অদৃশ্যরূপে অবস্থিতি করিয়া এই সকল নিপনীদিগকে উপহাসপূর্ব্বক তাহার সুদৃঢ় করকবলে বৃদ্ধাকে নিপীড়ন করিতেছিল।

আর একটি অন্তিম দারুণ অঙ্গআক্ষেপ—তাহার পর কাকাসান এলাইয়া পড়িল, তাহার মুখ খোলা, তাহার অৰ্দ্ধশরীর বাক্সের বাহিরে একপার্শ্বে হেলানো, তাহার হস্তদ্বয় লম্বমান, যেন পুতুলনাচ সমাপনান্তে একটি পুতুল বিশ্রাম করিতেছে।

যে ক্ষুদ্র ছায়াস্নিগ্ধ সমাধিক্ষেত্রের সম্মুখে এই শেষ দৃশ্য সমাপ্ত হইল, তাহা বোধ হইল যেন দেবতা-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, এবং মৃত্যুদ্বারা অনুমোদিত।

কেহ আর ইতস্ততঃ করিল না। রাস্তার কুলি ডাকাইয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে খনন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তীর্থদর্শনে বঞ্চিত হইতেও তাহারা অনিচ্ছুক, অথচ এই বৃদ্ধা বেচারীকে সমাধিবিহীন রাখিয়া যাইতেও নারাজ, বিশেষতঃ যখন দিনটা গরম হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং মক্ষিকাগণ ইহারই মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে কবর প্রস্তুত হইল। মৃতদেহের স্কন্ধ ধরিয়া তাহাকে বাক্স হইতে তুলিয়া, যে ভাবে চিরকাল বসিয়া থাকিত সেইরূপ ভূমে বসানো হইল। অরণ্যবৃক্ষতলে শিকারীগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ বিশুষ্ক বানর দেখিতে পায়, ইহাও সেইরূপ।

টোটোসান সব কার্য্য আপনি করিতে চেষ্টা করিল, তাহার মাথার ঠিক ছিল না; কঠিনহৃদয় কুলিগণ বাধা পাইয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল; সে শিশুর ন্যায় ক্রন্দনরব তুলিল এবং তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে হাতড়াইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল যে, নিদেনপক্ষে কাকাসানের চুলের অবস্থা অনন্তধামে উপস্থিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট পরিপাটি আছে কি না, তাহার কেশগুচ্ছ যথাক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে কি না, এবং তাহার উপর মাটি নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে বড় বড় কাঁটাগুলি তাহার কবরীতে বসাইয়া দিতে চাহিল।

বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরধ্বনি শ্রুত হইল; কাকাসানের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রেতাত্মা তাহার প্রেতরাজ্য আগমনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে।

সেই আবর্জ্জনাপূর্ণ বাক্স দেখিয়া কুলিগণের ঘৃণা হইল, তাহারা এ সকল জঞ্জালও কবরমধ্যে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিল ; সেই গাত্রবস্ত্র, পরিধানের জীর্ণচীর এবং ছোট ছোট পেয়ালা ও লণ্ঠন, এমন কি বাক্সখানা সমেত,—তাহারা বলিল উহাতে মৃত্যুর বীজ আছে।

তখন টোটোসান, তাহার এই সকল স্মৃতিচিহ্ন লোপ পাইবে দেখিয়া দুঃখে নৈরাশ্যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল ; রোদন করিতে করিতে একান্ত অবসন্নভাবে সে তাহাদের নিষেধ করিবার নিমিত্ত বাক্সের উপর শয়ন করিল।

কিন্তু আর একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উৎসবক্ষেত্রে যাইতেছিল। টোটোসানের উপর তাহার দয়া হইল, সে বলিল "আমি নদীর জলে এই সমস্তই ধুইয়া দিব।"

যে সকল লোক জড় হইয়াছিল তাহারা এই দুই ভিখারীকে সেই ঝিল্লিরবধ্বনিত শ্যামল নিরালায় একত্রে রাখিয়া পুনর্ব্বার দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিল।

নির্ম্মল স্রোতের জলে ভিখারিণী বাক্সসমেত সকল দ্রব্য সযত্নে ধৌত করিল। তাহার পর চীরগুলি বৃক্ষশাখার উপরে উজ্জ্বল রৌদ্রে বিছাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সব উত্তমরূপে শুখানো গুছানো ও ভাঁজ করা হইল, এখন টোটোসান আবার তাহার ভ্রমণে বাহির হইতে সমর্থ।

সে আপনাকে বাক্সে যুতিয়া আবার চলিল, একটা কিছু টানিয়া লইয়া বেড়ানো তাহার এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পশ্চাতে, ক্ষুদ্র গাড়িটি শূন্য। যে তাহার বন্ধু, তাহার মন্ত্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার চক্ষুস্বরূপ ছিল, তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া টোটোসান দিক্‌ভ্রষ্ট ভাবে ভ্রমিতে লাগিল। সে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীন কৃপাপাত্র, তাহার আয়ুঃশেষ

পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে নিতান্তই একেলা; প্রগাঢ়তর অন্ধকারে, বিক্ষিপ্তচিত্তে তাহার আশাহীন লক্ষ্যহীন পথে চলিয়াছে।

তারার আলোতে চৌদিকের শ্যামলতা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল, এবং তাহার মধ্য হইতে ঝিঁঝি পোকা মুক্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিল। অন্ধকে ঘিরিয়া যখন প্রকৃত অন্ধকার নামিতে লাগিল, তখন প্রভাতে গোর দিবার সময় বৃক্ষপত্র মধ্য হইতে যেরূপ মর্ম্মরধ্বনি নিঃসৃত হইয়াছিল আবার তাহা শ্রুত হইল। ইহা সেই প্রেতাত্মাদের মৃদুস্বর। তাহারা বলিতেছে "শান্ত হও, টোটোসান, সে এখন আমাদের ন্যায় মধুর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে, তুমিও শীঘ্র সে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; সে বৃদ্ধও নহে রুগ্নও নহে, কারণ সে মৃত; দেখিতেও কুশ্রী নহে, কারণ সে ধরণীগর্ভের বৃক্ষমূল মধ্যে সুপ্রচ্ছন্ন; কাহারো ঘৃণার পাত্রীও নহে, কারণ এখন সে ভূমির সারজনক পদার্থের অন্তর্ভূত। মৃত্তিকায় সংশোধিত হইয়া তাহার দেহ পবিত্র হইবে; কাকাসান কামেলিয়া, সিডারশাখা, বাঁশঝাড়, প্রভৃতি সুন্দর জাপানী বৃক্ষে পরিণত হইবে ... .।"

মানবপ্রকাশ।

তুমি লিখ্‌চ যে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন সাহিত্য অখণ্ডভাবে দেখা দিত, তাকে দ্বিধা বিভক্ত করে' তার মধ্যে থেকে তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত না। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তুমি বল্‌তে চাও যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মূলতত্ত্বের কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, ওটা কেবল আকস্মিক সম্বন্ধ।

এর থেকে বেশ দেখা যাচ্চে তোমাতে আমাতে কেবল ভাষা নিয়ে তর্ক চল্‌চে। আমি যাকে মূলতত্ত্ব বল্‌চি তুমি সেটা ঠিক গ্রহণ কর নি—এবং অবশেষে সে জন্য আমাকেই হয় ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদিও মূলতত্ত্ব শব্দটাকে বারম্বার ব্যাখ্যা করতে আমি ত্রুটি করিনি। এবারকার চিঠিতে ঐ কথাটা পরিষ্কার করা যাক্।

প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যে-রকম ভাবে দেখ্‌ত, আমরা ঠিক সে ভাবে দেখিনে। বিজ্ঞান এসে সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা দ্রাবক পদার্থ ঢেলে দিয়েছে, যাতে করে' সবটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ক্ষীর এবং নীর, ছানা এবং মাখন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্বসম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই, বৈদিক কালের ঋষি যে ভাবে উষাকে দেখ্‌তেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে উষা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

প্রাচীনকাল এবং বর্ত্তমানকালে প্রধান প্রভেদ হচ্চে এই যে, প্রাচীনকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মতের এবং ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য ছিল—গোলাপের কুঁড়ির মধ্যে তার সমস্ত পাপ্‌ড়িগুলি যেমন অাঁট বেঁধে একটিমাত্র সূচ্যগ্রবিন্দুতে আপনাকে উন্মুখ করে' রেখে দেয় তেমনি। তখন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় নি। তখনকার অখণ্ড জীবনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সূর্য্যকিরণের মত শুভ্র নিরঞ্জনভাবে ব্যক্ত হত। এখনকার বিদীর্ণ সমাজ এবং বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের শুভ্র সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। তার সাত রং ফোটে বা'র [illegible] কাসিসিস্ম এবং [illegible]

সেই জন্য প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। ক্লাসিক্ শুভ্র এবং রোমাণ্টিক্ পাঁচ-রঙা।

কিন্তু প্রাচীন পিতামহদের অবিশ্লিষ্ট মনেঃ সংসারের সাত রং কেন্দ্রীভূত হয়ে যে এক একটি সুসংহত শুভ্র মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পেত তার একটা কারণ ছিল। তখন সন্দেহ প্রবল ছিল না।

সন্দেহের প্রথম কাজ হচ্চে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা। আদিমকালে বিশ্বাসের কনিষ্ঠ ভাই সন্দেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই—সেই জন্যে তখন বিশ্বসংসার বিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ হয়ে যায় নি। কিম্বা সন্দেহ তখন এমনি নাবালক অবস্থায় ছিল যে, সংসারের প্রত্যেক জিনিষের উপর নিজের দাবী উত্থাপন করবার মত তার বয়স ও বুদ্ধি হয় নি। বিশ্বাসের তখন একাধিপত্য ছিল। তার ফল ছিল এই যে, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। উষাকে আকাশকে চন্দ্রসূর্য্যকে আমরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে' মনে করতে পারতুম না। এমন কি, যে সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম, যারা মনুষ্যত্বের এক-একটি অংশ মাত্র, তাদের প্রতিও আমরা স্বতন্ত্র পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম। এখন আমরা এই মনুষ্যত্ব আরোপ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে' থাকি, কিন্তু তখন এটা অলঙ্কারের স্বরূপ ছিল না। বিশ্বাসের সোনার কাঠিতে তখন সমস্তই জীবন্ত হয়ে জেগে উঠ্‌ত। বিশ্বাস কোনরকম খণ্ডতা সহ্য করতে পারে না। সে আপনার সৃজনশক্তির দ্বারা সমস্ত বিচ্ছেদ বিরোধ পূর্ণ করে', সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন করে' ঐক্য নির্ম্মাণের জন্যে ব্যস্ত।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রাচীন সাহিত্যে বেশি

মাত্রায় সাহিত্য-অংশ ছিল। অর্থাৎ মানুষ তখন আপনাকেই সর্ব্বত্র সৃজন করে' বস্‌ত। তখন মানুষ আপনারই সুখ দুঃখ বিরাগ অনুরাগ বিস্ময় আনন্দে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে' তুলেছিল। আমি বরাবর বলে' আস্‌ছি, মানুষের এই আত্ম-সৃজন পদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি। অনেকের মতে পুরাকালে এইটে কিছু অধিক ছিল। তখন মানবকল্পনার স্পর্শমাত্রে সমস্ত জিনিষ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে। এই জন্যই সাহিত্য অতি সহজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।

এখন বিজ্ঞান যতই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্চে ততই প্রকৃতি প্রাকৃতভাবে আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের সৃজনশক্তি সেখানে আপনার প্রাচীন অধিকার হারিয়ে চলে' আস্‌চে। নিজের যেসকল হৃদয়বৃত্তি তার মধ্যে সঞ্চার করে' দিয়েছিলুম সেগুলো ক্রমেই নিজের মধ্যে ফিরে' আস্‌চে। পূর্ব্বে মানবত্বের যে অসীম বিস্তার ছিল—দ্যুলোকে ভূলোকে যে একই হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হত এখন তা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মানবসমাজটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হচ্চে।

যাই হোক্‌, মানবের আত্মপ্রকাশ তখনকার সাহিত্যেও ছিল, মানবের আত্মপ্রকাশ এখনকার সাহিত্যেও আছে। বরঞ্চ প্রাচীন সাহিত্যের দৃষ্টান্তেই আমার কথাটা অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু "তত্ত্ব" শব্দটা ব্যবহার করেই আমি বিষম মুস্কিলে পড়েচি। যে মানসিক শক্তি আমাদের চেতনার অন্তরালে বসে' কাজ করচে, তাকে ঠিক তত্ত্ব নাম দেওয়া যায় না। যেটা আমাদের গোচর হয়েচে তাকেই তত্ত্ব বলা যেতে পারে। সেই মানসিক পদার্থকে কেউ বা আংশিক ভাবে জানে, কেউ বা জানে না অথচ তার নির্দ্দেশানুসারে জীবনের সমস্ত কাজ করে' যায়।

সে জিনিষটা ভারি একটা মিশ্রিত জিনিষ—তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাছোঁটা চাঁচাছোলা আটঘাটবাঁধা নয়। সেটা জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ। অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূল দেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব্ব ঐক্য লাভ করেছে—সাহিত্য সেই অতি দুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী। সেই ঐক্যকে আমি মোটামুটি জীবনের মূলতত্ত্ব নাম দিয়েছি। কারণ, সেটা যদিও লেখক এবং সাহিত্যের দিক থেকে তত্ত্ব নয় কিন্তু সমালোচকের দিক থেকে তত্ত্ব। যেমন জগতের কার্য্যপরম্পরা কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখনি তার নিত্যতা দেখ্‌তে পান তখনি তাকে নিয়ম নাম দেন।

আমি যে মিলনের কথা বল্লুম সেটা যত মিলিতভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখনি তাদের পরস্পরের সংঘাতে পরস্পর সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। তখনি বুঝ্‌তে পারি আমার সংস্কার এক জিনিষ, বাস্তবিক সত্য আর এক জিনিষ, আবার আমার কল্পনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তখন আমাদের একান্নবর্ত্তী মানসপরিবারকে পৃথক করে' দিই এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রাধান্য উপলব্ধি করি।

কিন্তু শিশুকালে যেখানে এরা একত্র জন্মগ্রহণ করে' মানুষ হয়েছিল, পৃথক হয়েও সেইখানে এদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য সেই আনন্দসঙ্গমের ভাষা। পূর্ব্বের মত সাহিত্যের সে আত্মবিস্মৃতি নেই, কেন-না এখনকার এ মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন। এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আলোচনা করি, তার পরে একসময়ে

সাহিত্যের মধ্যে, মানসিক ঐক্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করি। পূর্ব্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিল, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েচে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এই জন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এখনই সাহিত্যের বড় বেশি আবশ্যক এবং তার আদরও বেশি।

এখন এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে যতটা দূর যাওয়া যায় তার বেশি অগ্রসর হতে পারিনে। চুট্‌কি হাসি এবং খুচ্‌রো কথার মধ্যে আপনাকে আবৃত করে' রাখি। মানুষ সাম্‌নে উপস্থিত হবামাত্রই আমরা এম্‌নি সহজে স্বভাবতই আত্মসম্বৃত হয়ে বসি যে, একটা গুরুতর ঘটনার দ্বারা অকস্মাৎ অভিভূত না হলে, কিম্বা একটা অতি প্রবল আবেগের দ্বারা সর্ব্ববিস্মৃত না হলে আমরা নিজের প্রকৃত আভাস নিজে পাইনে। শেক্স্‌পিয়রের সময়েও এরকম সব আকস্মিক ঘটনা এবং প্রবল আবেগ সচরাচর উদ্ভব হতে পারত, এবং বিদ্যুৎ-আলোকে মানুষের সমগ্র আগাগোড়া এক পলকে দৃষ্টিগোচর হত; এখন সুসভ্য সুসংযত সমাজে আকস্মিক ঘটনা ক্রমশই কমে আস্‌চে, এবং প্রবল আবেগ সহস্র বাঁধে আট্‌কা পড়ে' পোষমানা ভাল্লুকের মত নিজের নখদন্ত গোপন করে' সমাজের মনোরঞ্জন করবার জন্যে কেবল নৃত্য করে; যেন সে সমাজের নট, যেন তার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং রুদ্ধ আক্রোশ ঐ বহুরোমশ আচ্ছাদনের নীচে নিশিদিন জ্বলচে না!

সাহিত্যের মধ্যে শেক্স্‌পিয়রের নাটকে, জর্জ্‌ এলিয়টের

নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে; আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়ভাঙ্গা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এই জন্যে শেক্সপিয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, "জোলা" অশ্লীল—কেন না তা কেবল আংশিক অনাবরণ।

আর একটু খোলসা করে' বলা আবশ্যক।—

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না—সমস্তটার একটা প্রতিনিধি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিধি কাকে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ বলে' মানতে আমাদের আপত্তি নেই। ভালবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের মানসিক বৃত্তি; এরা যদি অবস্থানুসারে মানবপ্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না। কেন না এদের সকলেরই ললাটে রাজচিহ্ন আছে;—এদের মুখে একটা দীপ্তি প্রকাশ পায়। মানুষের ভাল এবং মন্দ সহস্র কাজে এরা আপনার চিহ্নাঙ্কিত রাজমোহর মেরে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এদের সহস্রটা করে' সই আছে। অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া যায় তবে তাকে কে মানবে? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য? সেটা কি আমাদের অনেকানেক মহৎবৃত্তির চেয়ে অধিকতর সাধারণব্যাপী নয়? কিন্তু তাকে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি—এই

জন্যে সাহিত্যে তার স্থান নেই। কিন্তু কোন "জোলা" যদি পেটুকতাকে তাঁর নভেলের বিষয় করেন এবং কৈফিয়ৎ দেবার বেলায় বলেন যে, পেটুকতা পৃথিবীতে একটা চিরসত্য, অতএব ওটা সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পাবে কেন, তখন আমরা উত্তর দেব সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে, মানুষ চাই।

যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেম্‌নি; তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস; তারা দুর্ব্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ করে' নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখন কোথাও কোন স্থায়ী গৌরব লাভ করে নি—সমাজে তাদের চরম এভোল্যুশন্ হচ্চে, কেবল ফরাসী রান্না এবং ফরাসী নভেল।

সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তাহলে "জোলা"র নভেলে কোন দোষ দেখ্‌তুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোন অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ডজিনিষকে খণ্ডভাবেই দেখায়। আর, সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোন একটা অংশের অবতারণা করে তখন্ তাকে একটা বৃহতের একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায়, এই জন্যে আমাদের মানসগ্রামের বড় বড় মোড়ল গুলিকেই সে নির্ব্বাচন করে' নেয়।

কথাটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ঠিক সমরেখায় পড়ল কি না জানিনে। কিন্তু আমি যেটা বল্‌তে চাচ্চি সেটা এর দ্বারা কতকটা পরিস্ফুট হবে বলেই এর অবতারণা করা গেছে।

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।

শেক্সপিয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক একটা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় নিজের অন্তস্তলে প্রবেশ করে'

গুপ্তমানুষকে দেখ্‌তে পাই। সচেতন হলেই চির-অভ্যাসক্রমে সে লুকিয়ে পড়ে। এই জন্যে আজকালকার লেখায় প্রায় লেখকের বিশেষত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখা দেয়। কিম্বা খণ্ড খণ্ড আভাসকে কল্পনাশক্তির দ্বারা জুড়ে' এক করে' গড়ে' তুল্‌তে হয়। অন্তররাজ্যও বড় জটিল হয়ে পড়েছে, পথও বড় গোপন। যাকে ইংরাজিতে ইন্‌স্পাইরেশন্‌ বলে সে একটা মুগ্ধ অবস্থা; তখন লেখক একটা অর্দ্ধচেতন শক্তির প্রভাবে কৃত্রিম জগতের শাসন অনেকটা অতিক্রম করে এবং মনুষ্যরাজার যেখানে খাস দরবার সেই মর্ম্মসিংহাসনের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হয়।

কিন্তু নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক্, আর অন্যের সুখ-দুঃখের দ্বারাই হোক্, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক্ আর মনুষ্য-চরিত্র গঠিত করেই হোক্ মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর সমস্ত উপলক্ষ্য।

প্রকৃতিবর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোন মাথাব্যথাই নেই—কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। এমন কি, ভাষা তা ছাড়া আর কিছু পারে না। চিত্রকর যে রং দিয়ে ছবি আঁকে সে রঙের মধ্যে মানুষের জীবন মিশ্রিত হয় নি—কিন্তু কবি যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তার প্রত্যেক শব্দ আমাদের হৃদয়ের দোলায় লালিত-পালিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে সেই জীবনের মিশ্রণটুকু বাদ দিয়ে ভাষাকে জড় উপাদানে পরিণত করে' নিছক্ বর্ণনা-টুকু করে' গেলে যে কাব্য হয় একথা কিছুতে স্বীকার করা যায় না।

সৌন্দর্য্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

হ্যাম্‌লেটের ছবি সৌন্দর্য্যের ছবি নয়, মানবের ছবি—ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

কিন্তু সৌন্দর্য্য কি গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিষ যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এই জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে যতই সচেতন হব, প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই ত কবির বর্ণনার বিষয় নয়। প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সে ত বর্ণনীয়। কিন্তু সেও আমাদের হৃদয়ের জিনিষ, প্রকৃতির জিনিষ নয়। অতএব, এমন কোন বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, যা সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম্ম নেই কিম্বা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকটসম্পর্কে বদ্ধ নয়।

আমার বোধ হচ্চে আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম, যে, সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এইরকম বুঝিয়ে গেছে। আমার সেই সামান্য আদিম অপরাধ তুমি কিছুতেই মার্জ্জনা করতে পারচ না; তার পরে আমি যে কথাই বলি না কেন তোমার মন থেকে সেটা আর যাচ্চে না। আদম যেমন প্রথম পাপে তাঁর সমস্ত মানববংশসমেত স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন তেম্‌নি আমার সেই প্রথম ত্রুটি ধরে' আমার সমস্ত সংস্কার ও যুক্তি-পরম্পরাসুদ্ধ আমাকে মতচ্যুত করবার চেষ্টায় আছ।

আমার বলা উচিত ছিল লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকা-

শই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল)। কখন নিজত্ব দ্বারা, কখন পরত্ব দ্বারা। কখন স্বনামে কখন বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য। আমার গোড়াকার চিঠিতে যদি এ কথা প্রকাশ হয়ে না থাকে তা হলে জেনো সেটা আমার অনিপুণতাবশতঃ। একে তত্ত্ব, সাহিত্যের তত্ত্ব, তাতে আবার আমার মত লোক তার ব্যাখ্যাকারক। কথা আছে, একে বোবা তাতে আবার বোলতায় কাম্‌ড়েছে—একে গোঁ গাঁ করা বই আর কিছু জানে না তার উপরে কামড়ের জ্বালায় গোঁগাঁনি কেবল বাড়িয়ে তোলে।

আমি যে এই আলোচনা করচি এ যেন মানসিক মৃগয়া করচি। একটা জীবন্ত জিনিষের পশ্চাতে ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্চি—পদে পদে স্থানপরিবর্ত্তন করচি, কখনো পর্ব্বতের শিখরে কখনো পর্ব্বতের গুহায়। এই জন্য আমার সমস্ত আলোচনায় যদিও লক্ষ্যের ঐক্য আছে কিন্তু হয় ত পথের অনৈক্য পাবে। কিন্তু সে সমস্ত মার্জ্জনা করে' তুমিও যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, যদি আমার পাশাপাশি ছোট, তা হলে আমার মৃগটি যদি বা সম্পূর্ণ ধরা না পড়ে নিদেন তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যদি তোমাকে বোঝাতে ভুল করে' থাকি তুমি নিজে ঠিকটা বোঝ। অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে মাছটা ধরে' দিতে না পারি, আমার পুকুরটা ছেড়ে দিচ্চি, তুমিও জাল ফেল! কিন্তু, কিছু উঠ্‌বে কি? সে কথা বল্‌তে পারিনে—সে তোমার অদৃষ্ট, কিম্বা আমার অদৃষ্ট, যাই বল!

কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। তুমি

আমারই কথাটাকে কেবল খুঁটি ধরে' টেনে টেনে বের করছ—নিজের কথাটিকে বরাবর বেশ ঢেকেচুকে সাম্‌লে রেখেছ। আমি যেন কেবল একটি জীবন্ত তলোয়ারের সঙ্গে লড়াই করচি—কেবল খোঁচা খাচ্চি, কাউকে খোঁচা ফিরিয়ে দিতে পারচিনে। আমি বার বার যতই বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দাঁড়াচ্চি তোমার ততই আঘাত করবার সুবিধে হচ্চে। কিন্তু এটাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলে?

আমি ব্রাহ্মণ—কেবলমাত্র যুদ্ধের উৎসাহে আনন্দ পাইনে। আসল কথাটা কি তাই জান্‌তে পারলেই চুপ করে' যাই। আমি ত বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে' তোলা। তুমি কি বল?—

কিন্তু তুমি শুন্‌চি কলকাতায় আস্‌চ—আমিও সেখানে যাচ্চি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখ্‌চি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মোকাবিলায় নিষ্পত্তি কুইনাইন্‌ দিয়ে জ্বর ঠেকানোর মত। হয়ত চট্‌ করে' ছেড়ে যেতে পারে নয় ত গুম্‌রে গুম্‌রে থেকে যায়, আবার কিছুদিন বাদে কেঁপে কেঁপে দেখা দেয়। ইতি।

স্বরলিপি।

("মায়ার খেলা" হইতে)

রাগিণী দেশ—কাওয়ালি।

প্রমদা।— দেলো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে
সাধের বকুল ফুলহার।

আধফুট' যুঁইগুলি
যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার!
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারে বার!
সখি।— আজি এত শোভা কেন!
আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে,
সখি, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

৩ । ৩

॥ মা রা মা পা। র্সা -া -া -া । র্সর্রা র্সজ্ঞা ধা পা।
॥ দে লো স খি। দে — —- । পরা ইয়ে গ লে।

। পধা পমা ধপা মগা। রা -া -া -া। রাঃ মঃ রা সা।
। সাধে র, ব কুল ফুল। হা — — র্। আ ধ ফু টো।

। রা সা ন্া সা। রা মা মা মা। পা পা পা পধা।
। জুঁ ই গু লি। য ত নে, আ। নি য়ে তু লি।

। মা পা না র্সা। র্সর্রা র্সজ্ঞা ধা পা। পধা পমা ধপা মগা।
। গাঁ থি গাঁ থি। সাজা য়ে,দে মো রে। কব রি,ভ রিয়ে ফুল।

। রা -া -া -া। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞর্সা র্সর্সা র্সা র্সর্সা।
। ভা — — র। তু লে দে লো। চ ঞ্চল কু ন্তল।

। র্সর্রা র্সঞা র্রর্সা ঞধা। পা -া -রা -রমা ॥ মা পা না না।
। কপো লে,প ড়িছে বারে। বা — — র্ ॥ আ জি এ ত।

। {র্সা নর্সর্রা র্সনা র্সা। র্সা র্সর্রা র্সা না। র্সা নর্সর্রা র্রা র্রর্গা।
। {শো ভা কে ন। আ ন ন্দে, বি। ব শা হে ন ।

। (র্গর্রা র্সা র্রর্সা না) ।} র্সা না র্সা র্সা। র্সর্রা র্সঞা ধা ঞধা।
। (আ জি এ ত) ।} বি শ্বা ধ রে। হাসি নাহি ধ রে ।

। পা ধপা মা ধা। ধা ঞধা পা ধপা। মা মধা পা মগা।
। লা ব ণ্য, ঝ। রি য়া প ড়ে। ধ রা ত লে।

। রগমা মা মা মগা। রগা গা গা -রা। সরা রা রা -া।
। স খি তো রা। দে খে যা —। দে খে যা —।

। রমা রা মা পা। র্সা -া -া -া। র্সর্রা র্সঞা ঞধা পা।
। ত রু ণ, ত। নু — — —। এত রূপ রা শি।

। পধা পমা ধপা মগা। রা -া -া -মা ॥ ॥
। বহি তে,পা রেনা বুঝি। আ — — র্ ॥ ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্ত স্বর।

২। া=এক মাত্রার চিহ্ন। দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে আকার দিলে দুইটি অর্দ্ধমাত্রার স্বর কিম্বা কতকগুলি ভগ্নমাত্রিক স্বর একমাত্রার সামিলে আসিল এইরূপ বুঝায়; যথা পধা, রগমা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার পৃথক্ চিহ্ন হচ্চে বিসর্গ যথা, সঃ। দেড়মাত্রা=াঃ; যথা, সাঃ।

৩। উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের উপর রেফ্।

খাদ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের নীচে হসন্ত।

৪। ঞ=কোমল ন।

পাশের যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় ও থামিয়া অন্তরা প্রভৃতি অন্য কলি ধরিতে হয় সেইখানে মাথার উপর যুগল ছেদ বসে।

গুম্ফ-বন্ধনী=বিশেষ-পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। যেখানে এইরূপ } বিমুখী গুম্ফ-বন্ধনী দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী যেস্থানে এইরূপ { প্রমুখী গুম্ফ-বন্ধনী আছে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি হইবে। পুনরাবৃত্তিকালে যেখানে এইরূপ ( ) বক্র-বন্ধনী দেখিবে সেই বন্ধনীর অন্তর্গত সুরগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহার পরের সুরগুলি ধরিতে হইবে। যথা, এই গানের অষ্টম পংক্তিতে "আজি এত"র পরে ছাড়িয়া দিয়া (সপ্তম পংক্তি) "শোভা কেন" হইতে ফের ধরিতে হইবে। এবং ফের যখন "আজি এত"র কাছে আসিবে তখন "আজি এত" একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তৎপরবর্ত্তী পদের সুর "বিম্বাধরে" হইতে সুরু করিবে।

"কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়!" *

ভৈরবী—একতালা।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)!
কেন মন কেন এমন করে!
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো
তবু মনে পড়ে!
চারিদিকে সব মধুর নীরব,
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে!

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত গান।

যেন কাহার বচন   দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে !
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো
তবু মনে পড়ে !

৩+
।

। রা জ্ঞা -রমা ॥ জ্ঞা -া -ণা । -সা ঞ্‌দা -প্‌দা । ঞ্‌া -সাঃ সঃ ।
। কে ন — ॥ ন — য় । — ন — । আ — প ।
॥
। জ্ঞাঃ -ণঃ -সা । সা -ণা -জ্ঞমজ্ঞা । -ণা -জ্ঞা ণা । সা -া -া ।
। নি — — । ভে — — । — — সে । যা — য় ।

। রা জ্ঞা -রমা ॥ -া সা সঞ্‌া । সা -া সা । -দা দা -পদপা ।
। (জ লে) — ॥ —কে ন । ম — ন । — কে — ।

। মা -া -া । ক্ষা -া -মক্ষমা । জ্ঞা -রা জ্ঞা । -রমা জ্ঞা -রা ।
। ন — — । এ — — । ম — ন । — ক — ।

। জ্ঞা -রজ্ঞা -সা । জ্ঞা রজ্ঞা -মা ॥ সা সঞ্‌া । সা -া সা ।
। রে — — । (কে ন) — ॥ যে ন । স — হ ।

। -দা পা -া । পা -দা ঞা । -া -র্সা -া । ঞর্সা -র্ণা র্সা ।
। — সা — । কি — ক । — থা — । ম — নে ।

। -া র্সা -ঞা । ঞা -দা দা । -পা পা -মা । পা -দা পদা ।
। — প — । ড়ে — ম । — নে — । প — ড়ে ।

। -ঞা ধা -পা । মা -া মা । -ক্ষা ক্ষা -মা । জ্ঞা -রা জ্ঞা ।
। — না — । গো— ত । — বু — । ম — নে ।

। -রমা ঙ্গা -রা । ঙ্গা -রঙ্গা -সা । ঙ্গা -রঙ্গা মা ॥ । । । ।
। — প — । ড়ে — — । (কে — ন) ॥ ।

। সা -া সা । -লসা লা -া । {ঙ্গা -া মা । -া মা -া । মা -া ঙ্কা ।
। চা — রি । — দি — । {কে — স । — ব — । ম — ধু ।

। -ঃমঃ ঙ্গা -া । মা -া ঙ্গা । (-লঙ্গলা সলা -ঙ্গমা । ঙ্গা -লঙ্গা লা ।
। — র — । নী — র । (— ব — । চা — রি ।

। -সা সা -লা) ।} -লঙ্গলা সা -া । -া -া -া । । সা সঞা ।
। — দি —) ।} — ব — । — — — । কে ন । ।

। সা -া সা । -দা পা -া । পা -দা ঞা -া র্সা -া ।
। আ — মা । — রি — । প — রা । — ণ — ।

। ঞর্সা -র্লা র্সা । -া ঞা -া । দঞা -দা পা । -া পা -মা ।
। কেঁ — দে । — ম — । রে, — কে । — ন — ।

। পা -া পা । -দা পদা -ঞা । দা -পদপা মা -ঙ্গা ঙ্কা -মা ।
। ম — ন । — কে — । ন — এ । — ম ।

। ঙ্গা -রা ঙ্গা । -রমা ঙ্গা -রা । ঙ্গা -া -সা । ঙ্গা -রঙ্গা মা ॥
। ন — কে । — ন — । রে — — । (কে — ন) ॥

। া সা সা । সা -া সা । -লসা লা -া । ঙ্গা -া মা ।
। যে ন । কা — হা । — র — । ব — চ ।

। -া মা -া । মা -া ঙ্কা । -ঃমঃ ঙ্গা -া । মা -া ঙ্গমগা ।
। — ন — । দি — য়ে । — ছে — । বে — দ ।

। -লা সলা -ঙ্গমা । ঙ্গা -মা ঙ্গা । -লঙ্গলা সা -লা । ঙ্গা -া রঙ্গা ।
। — ন — । কা — হা । — র — । ব — চ ।

। -ষা মা -া। মা -া ঋদঋা। -ঃমঃ ঋা -া। মা -া ঋা।
। – ন –। দি – য়ে। – ছে –। বে – দ।

। -লঋলা সা -া। -া -া -া। । সা সঞ্া। {{সা -দা দা।
। – ন, –। – – –। যে ন। {{কে – ফি।

। পা পা -া। পা -া পা। -ধা পা -মা। পা -দা পদা।
। – রে –। গি – য়ে। – ছে –। অ — না।

। -ঞা দা -পা। (মা -পমা -ঋা। মা -ঋলা সা) ।}} মা -া মা।
। — দ —। (রে — —। যে — ন) ।}} রে, — বা।

। -ঋা ঋা -মা। ঋাঃ -রঃ ঋা। {{{-া ঋা -রা। ঋা -রা ঋরা।
। — জে —। তা — রি। {{{– অ —। য — ত।

। -মা ঋা -ঋঋা। সা -লা ঋা। মঋা লা -ঋলা। (সা -া রা।
। — ন –। প্রা – ণে। র প –। (রে – বা।

। -া ঋা -রা। ঋা -রপা মা) ।}}} সা -া -া॥
। — জে —। তা – রি) ।}}} রে, – –॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। ঞ=কোমল ন; ল=কোমল র; দ=কোমল ধ; ঋ=কোমল গ; ঽ=কড়ি ম।

২। গানের মধ্যে ক্ষণিক বিশ্রামের নাম বিরাম। একমাত্রা কালস্থায়ী বিরামের চিহ্ন হচ্চে হাইফেন্-বিবর্জ্জিত আকার। যথা, এই গানের পঞ্চম পংক্তিতে। া া া া। পূর্ব্বে আমরা ঐ স্থলে শূন্য বসাইতাম। এইক্ষণে তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। এই গানটির স্বরলিপি সা-খরজ বসান হইয়াছে কিন্তু মা-খরজে গাইলে ভাল শুনায়।

গোবিন্দদাস।

যাঁহারা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের নাম তাঁহাদের নিকটে সুপরিচিত। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা-সম্পর্কিত অনেকগুলি পদাবলীতে গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসভণিত কোন কোন কবিতা এতই মধুর যে তাহা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দদাসের পদাবলী একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, গোবিন্দদাস অনেকস্থলে বিদ্যাপতির ভাষা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। এই গোবিন্দদাস সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন গোবিন্দদাস নামে চারিজন ব্যক্তি পদরচয়িতা ছিলেন; কেহ বলেন ছয়জন। আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তির মতে একজন গোবিন্দদাস, চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। ১২৮২ সালের "বান্ধব" পত্রিকায় "গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মত বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ভ্রমাত্মক মত প্রকটিত হইয়াছে, যাহাতে গোবিন্দদাসের প্রকৃত ইতিহাস অধিকতর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শন আবশ্যক। বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ ও মহাজনপদাবলী আলোচনা করিয়া গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আমরা

যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা "সাধনায়" প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রবন্ধলেখক বলেন, "গোবিন্দদাস নামে সর্ব্বশুদ্ধ নয় ব্যক্তির নাম বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ছয়জন পদাবলীরচয়িতা।" এই ছয়জনের প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন "আষাঢ়ে গল্প"-মূলক প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "কাঠগড়ের (কাটোয়ার) উত্তরস্থিত প্রসিদ্ধ ঝামটগ্রামের নিকটবর্ত্তী বনপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহারই ঔরস পুত্র।" এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকেই প্রবন্ধলেখক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদায় প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে কাটোয়ার নাম "কণ্টক নগর" লিখিত হইয়াছে; "কাষ্ঠগড়" কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ "ঝামট" নামে কোন গ্রামের বিষয় আমরা অবগত নহি। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মভূমির নাম "ঝামটপুর" এবং তাহা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে, গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমকালীন লোক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে লেখক একটী অদ্ভুত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"গোবিন্দদাস কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থেরও প্রণেতা, উক্ত গ্রন্থখানি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর ন্যায় যে অত্যন্ত প্রাচীন ও গৌরাঙ্গের প্রিয়বস্তু ছিল নিম্নলিখিত কবিতা তাহার প্রমাণ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্র দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

"কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ ভক্তবর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চৈতন্যদেব যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীতীরে উপনীত হয়েন, সেই সময়ে তত্রত্য বৈষ্ণবগণের নিকটে "ব্রহ্মসংহিতা" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ দেখিতে পান এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়েন। * "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থের স্থানে স্থানে কর্ণামৃতের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের আর একটী যুক্তি এই যে, বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতার শেষে গোবিন্দদাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহার মনে সহসা এই বিশ্বাসেরই উদয় হইয়াছে যে, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে "অনেক পদ একত্রে রচনা করিয়াছেন।" লেখক গোবিন্দদাস নামযুক্ত বিদ্যাপতির এই কয়েকটী পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর।"

পুনশ্চ

"বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর।"

গোবিন্দদাসের আরও দুইটী কবিতাতে রাজা বৈদ্যনাথ ও রূপনারায়ণের নাম সংযুক্ত দেখা যায়।

---

* তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবিন্নাতীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল॥
চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যখণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।

"কমল নীত চরণকমল মধু
পাওয়ে যো সোই সুজান।
রাজা বৈদ্যনাথ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান॥"
"লোচন খঞ্জন জগতজনরঞ্জন
কুলবতী যুবতী বরত ভয়ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ণ
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥"

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাস অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন; এই কারণে তাঁহার কবিতাতে হিন্দী ও হিন্দীসম শব্দের অধিকতর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কেবল গোবিন্দদাস নহে, পরবর্ত্তী প্রায় সমুদায় বৈষ্ণব কবিই অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভণিতাসম্বলিত উপরোক্ত কবিতাগুলি গোবিন্দদাসের রচিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রায়বসন্ত ও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত

"রায়বসন্ত মধুপ আনন্দিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"
"রায়বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ।"

এই পদাংশ দেখিয়া লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে, "অনেকে বিদ্যাপতি ও রায়বসন্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাই হউক বা উঁহারা সমসাময়িকই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং লেখক মহাশয়ের মতে গোবিন্দদাস নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির সমকালীয় ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রায়বসন্ত ও বিদ্যাপতি যে এক ব্যক্তি না

হইলেও তাঁহাদিগকে সমসাময়িক হইতেই হইবে, এরূপ কোন বাঁধা নিয়ম নাই; বোধ হয় পাঠক মহাশয়গণ তাহা স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু প্রবন্ধলেখক মহাশয় গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে এতই ব্যতিব্যস্ত যে, যুক্তি প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, ইহাঁরা সকলেই একস্থানবাসী, এক সময়ের লোক এবং ইহাও অসম্ভব নয় যে, সকলেই এক রাজপরিবারস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বোধ হয় তন্মধ্যে বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাসদ্, এবং গোবিন্দদাস রূপনারায়ণ ও বৈদ্যনাথের সভাসদ ছিলেন। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরগ্রাম, আর বিদ্যাপতি মিথিলানিবাসী। পরন্তু শিবসিংহ ও রূপনারায়ণ দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি নহেন, শিবসিংহের পূর্ণ নাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যক বঙ্গদর্শনে পণ্ডিতবর ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাপতির জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশস্থ বীসপী গ্রামে বাস করিতেছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

লেখকমহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন, "অতএব আমরা এই প্রস্তাবে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" তিনি কিরূপ "যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন" করিয়াছেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

গোবিন্দানন্দ ভাগবত, গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ এই তিন ব্যক্তিকেই লেখক মহাশয় এক একজন স্বতন্ত্র পদকর্ত্তা

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদের কেবল নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত বিশেষ বিবরণ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিশাকীর্ত্তন ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনের পর নীলগিরিতে সপ্ত সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দদত্ত শিষ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। গোবিন্দানন্দ একজন মহাভাগবত ও গোবিন্দদত্ত প্রধান কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। বাসু ঘোষের ন্যায় ইঁহারা স্বরচিত পদ গান করিতেন কি না তাহার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ লেখক দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার প্রথমটী গোবিন্দানন্দের ও দ্বিতীয়টী গোবিন্দদত্তের বলিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "গোবিন্দানন্দ চৈতন্যের প্রেমোন্মাদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া কহিতেছেন, 'পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি' ইত্যাদি। এবং "ইনি (গোবিন্দ দত্ত) একজন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, ইঁহার স্বরচিত অনেকগুলি পদও মনোহর, কিন্তু তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী অনুপ্রাসপূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ করিবার কারণ পদটী পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।" লেখকের অভিপ্রায় কি আমরা তাহার কিছুই মর্ম্মবোধ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক পদটীর ভণিতাটুকু আমরাও উদ্ধৃত করিতেছি।

গোয়ল গাহি গিরীশ্বরনন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ।

এই ভণিতায় গিরীশ্বরনন্দন গোবিন্দের নাম আছে, সুতরাং ইনি যে একজন গানরচয়িতা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপ-

রোক্ত দুইটী পদ গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দদত্তের রচনা, লেখক তাহা কি উপায়ে জানিতে পারিলেন ?

তৎপরে গোবিন্দ ঘোষ। লেখক ইহাঁকেও একজন গোবিন্দদাস নামে পরিচিত করিয়াছেন। ইহাঁরা তিন ভাই,—গোবিন্দ, মাধব ও বাসুঘোষ চৈতন্যের প্রিয় সহচর ছিলেন। নীলাচলে সংকীর্ত্তনের সময় গোবিন্দ ঘোষ একটী গায়কসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্তের আদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থ নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিলে মাধব ও বাসুঘোষ তাঁহার সঙ্গে আইসেন; গৌরগতপ্রাণ গোবিন্দ নীলাচলে প্রভুর নিকটেই ছিলেন। ইহাঁরা তিনজনে সঙ্গীত সংকীর্ত্তনের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বাসুঘোষের রচিত চৈতন্যলীলা সঙ্গীত তৎকালে ভক্তসমাজে আদরপূর্ব্বক গীত হইত। গোবিন্দ ঘোষ রচিত দুই চারিটী কবিতা বা গান শুনিতে পাওয়া যায়। লেখক তাহার একটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটীর শেষ চরণ এই—

শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বাঁধে
গদাধরে বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইব মরিয়া।

"এ গোবিন্দ ঘোষে কয়" ইত্যাদি বাক্যে রচয়িতা গোবিন্দ ঘোষ নামে স্পষ্টরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্দেশে ইনি "ঘোষঠাকুর" নামে প্রখ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার জন্মস্থল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত যোগ্রামকুলীনগ্রাম। যেখানে হউক, বৃদ্ধাবস্থায় ইনি অগ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অগ্রদ্বীপে প্রতিবর্ষে "ঘোষঠাকুরের" তিরোভাব উপ-

লক্ষে মেলা হইয়া থাকে। অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। * এই সকল কারণে অন্যান্য বৈষ্ণব-বাবাজী অপেক্ষা বরাবর ইঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইনি স্বনাম-বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও সাধু বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গোবিন্দ আচার্য্যকে প্রবন্ধলেখক অন্যতম গোবিন্দদাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "মালী-হাটী গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনিও গৌরাঙ্গের পরমভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।" শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে লেখক এপ্রকার ভ্রমে পতিত হইতেন না। "নরোত্তমবিলাস" ও "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে ইঁহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভাগারথী-তীরস্থ চাখুন্দিয়া গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা চৈতন্যের অনুগত ভক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে ইনি কাটোয়ার অন্তঃপাতী জাজিগ্রামে মাতামহাশ্রয়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস পিতৃসন্নিধানে গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব অবগত হইয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। চৈতন্যদেব যখন জীবনের শেষাবস্থায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্ত-মণ্ডলীতে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য ভক্ত বৈষ্ণবগণের পরামর্শে শ্রীনিবাস চৈতন্যচরণ দর্শনের জন্য বহির্গত হয়েন, এবং কিয়দ্দূর গমন করার পর পথিমধ্যে গৌরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেন। চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরে, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে ইনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী প্রধান প্রধান জ্ঞানী ও ভক্ত-

* ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাহায্যে রাজা মানসিংহ দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আইসেন। তিনি অগ্রদ্বীপে উপনীত হইয়া ঘোষঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বৈষ্ণবগণ শ্রীনিবাসের বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবন্নিষ্ঠাতে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের পর শ্রীনিবাস বিবাহ করেন। ইঁহার তিনটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ ও গীতগোবিন্দ। গৌড়লীলা সমাপ্তির বহুদিন পরে অবধূত নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী জাজিগ্রামে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসের এই পুত্রগণকে অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের এই গীতগোবিন্দ নামক পুত্রকেই লেখক চৈতন্যের সমকালীন ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য বলিতেছেন। টিপ্পনীতে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের একটী কবিতাতে "প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত" এইটুকুমাত্র পাঠ করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "উৎকলাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য গৌরাঙ্গের আশ্রয় লইতে অনেক যত্ন করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া নৃপতির সহিত গৌরাঙ্গ কোন সংস্রব রাখিতে চান না। অনেক সাধ্যসাধনার পর তৎপ্রতি নিত্যানন্দের কৃপা হয়। এবং গৌরাঙ্গের অকৃপাতে যখন প্রতাপাদিত্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন, তখন নিত্যানন্দ গোবিন্দাচার্য্যের দ্বারা গৌরাঙ্গের এক বহির্ব্বাস লাভ করিয়া চৈতন্যের কৃপার চিহ্নস্বরূপ উহা প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রেরণ করেন। এই বহির্ব্বাস পাইয়া প্রতাপাদিত্য আপাততঃ প্রাণধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেই অবধি গোবিন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত সখ্য জন্মে। শ্রীনিবাসসুত গোবিন্দ প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এবং স্বীয় কোন কোন পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়া গোবিন্দও তৎপ্রতি প্রচুর দয়াপ্রকাশ করিতেন।" বোধ হয় লেখক অবগত নহেন যে, তদানীন্তন উৎকলাধিপতির নাম

প্রতাপাদিত্য নহে। গজপতি প্রতাপরুদ্র নামক গঙ্গাবংশীয় কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎ-কলের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দাচার্য্যের নিকট হইতে প্রতাপরুদ্রের জন্য চৈতন্যের বহির্ব্বাস চাহিয়া লয়েন নাই, ঈশ্বরপুরীর প্রেরিত চৈতন্যের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্য গোবিন্দই নিত্যানন্দকে বহির্ব্বাস দিয়াছিলেন।* সুতরাং এইসূত্রে প্রতাপরুদ্রের সহিত গোবিন্দাচার্য্যের বন্ধুতার কথা লেখকের কল্পনা মাত্র। লেখক গীতগোবিন্দের স্বীয় পরিচয়াত্মক পদটী প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভণিতায় আছে—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসসুত
গীতগোবিন্দচিত ভোররে॥

এই কবিতাতে শ্রীনিবাসসুত গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইনি গোবিন্দদাস নামে আপনাকে আর কোথাও পরিচিত করেন নাই। এদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার (শিষ্য) বলিয়া যাঁহারা আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা আচার্য্য নামেই গুরুবংশের উল্লেখ করিয়া থাকেন। উক্ত কবিতার "শ্রীনিবাসসুত গীতগোবিন্দ ভোররে" এই ভণিতাতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে গীতগোবিন্দ নামে একজন স্বতন্ত্র বৈষ্ণব কবি ছিলেন। আমরা কোন কোন প্রাচীন বৈষ্ণবের প্রমুখাৎ শুনিলাম গীতগোবিন্দের রচিত আরও দুই চারিটী পদ আছে। সুতরাং ইঁহাকে গোবিন্দদাস নামে অভিহিত করিবার কোন কারণ নাই।

---

* তবে নিত্যানন্দ গোঁসাই গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রবন্ধলেখক যে ছয়জন গোবিন্দদাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচজনের সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া অবগত হইলাম যে ইঁহারা কেহই সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস নহেন। পদ্মার দক্ষিণতীর সমীপবর্ত্তী বুধরী-নিবাসী * বৈদ্যবংশোদ্ভব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ কবিরাজই প্রকৃত গোবিন্দদাস। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মাতটের অনতিদূরবর্ত্তী খেতরি বা খেতুর-গ্রামনিবাসী নরোত্তম ঠাকুর ও জাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য্য যে সময়ে এদেশে হরিভক্তি ও নামসংকীর্ত্তন প্রচার করেন, সেই সময়ে ইহাঁরা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব ইঁহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে ঘোর শাক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত ভক্তমালে এইরূপ লিখিত আছে। একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বীয় বাসভবনের সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে ভক্তগণ সহ হরিকথাপ্রসঙ্গে সুখাসীন আছেন; এমন সময়ে রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া শিবিকারোহণে সেইস্থানে আসিয়া বিশ্রামলাভের জন্য উপস্থিত হইলেন। যুবা রামচন্দ্রের গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী দর্শনে প্রীত হইয়া শ্রীনিবাস ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন,

এই যে পুরুষ হেন সৌন্দর্য্যে শোভয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সুশোভয়॥

---

* "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে লিখিত আছে গোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া বুধরীতে আসিয়া বাস করেন, সুতরাং উক্ত গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে বুধরী পদ্মা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত, অতএব তাহা মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হওয়াই সম্ভব।

তৎপরে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বৈরাগ্য-উদ্দীপক অনেক উপদেশ দেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশে রামচন্দ্রের হৃদয়ে অকস্মাৎ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, বিবাহের দুই তিন দিন পরেই রামচন্দ্র, আচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে ইনি পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজকে বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিবার জন্য ইনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তিসেবক বামাচারী গোবিন্দ তাহা উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিতেন। কথিত আছে, একদিন একজন বৈষ্ণব ইঁহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিথির ধর্ম্মমত না জানিয়া গোবিন্দ দেবীমন্দিরে তাহার আহ্নিক পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অতিথি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তথায় মুক্তকেশী কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে এবং নৈবেদ্য পুষ্পাদি পূজার বিবিধ উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। সেখানে শালগ্রামশিলাও রহিয়াছে দেখিয়া অতিথি সমুদায় পুষ্পাদি দ্বারা শালগ্রামের অর্চ্চনা করিল। পরে নিয়মিত পূজক ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই উৎসৃষ্ট নৈবেদ্যাদি পুনর্ব্বার কালীকে নিবেদন করিয়া চলিয়া গেল। সেইদিন রাত্রিতে দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "আমি আজি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পরাৎপর হরি আমার প্রভু, তুমি পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির ভজনা কর।" দেবীর বাক্যে গোবিন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে গোবিন্দ গ্রহণী রোগে মরণাপন্ন হন। অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবামাত্র ভগবতী আকাশবাণীতে গোবিন্দকে পুনর্ব্বার

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় করিতে বলেন। দেবীর বাক্যে গোবিন্দের চৈতন্য হয়। তখন অনুতাপ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে দৈন্যোক্তি করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইবামাত্র রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া বুধরীতে আসিলেন। গোবিন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অতিকষ্টে হাতযোড় করিয়া আচার্য্যকে অস্ফুট গদগদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বক্ষস্থল ভাসাইয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় শ্রীনিবাস গোবিন্দকে 'হরিনাম মহামন্ত্রে' দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের শান্তি হইল, এবং তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া এই পদটী রচনাপূর্ব্বক ভক্তগণকে শুনাইলেন।

ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু।
দুর্লভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্দু॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লাভ লাগি॥
এ রূপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত।
কমলদলজল জীবন টলমল সেবহ হরিপদ নিত॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস।
পূজত সখীগণ আত্মসমর্পণ গোবিন্দদাস অভিলাষ॥ *

ভক্তমালের বর্ণনানুসারে এই পদটীই গোবিন্দদাসের সর্ব্বপ্রথম রচনা। দীক্ষার পর হইতে ইনি "গোবিন্দদাস ঠাকুর" নামে বিখ্যাত হন। এবং রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসসিঞ্চিত প্রেমলীলা ও অপরূপ গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বিস্তর পদ রচনা করেন।

গোবিন্দদাস ক্রমশঃ "সঙ্গীতমাধব" নামে নাটক ও "গীতা-

* এই পদটীর নানারূপ পাঠান্তর আছে। আমরা তিন চারিখানি পুস্তক মিলাইয়া লিখিলাম।

মৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবন গমন করিলে, তত্রত্য ভক্তগণ তাঁহার কাব্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করেন। জীবগোস্বামীপ্রমুখ বৃন্দাবন-বাসী প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে গোবিন্দদাসের আসন অতি উচ্চ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কবি বলিয়া বিশেষ সম্মানিত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গোবিন্দদাসরচিত "সঙ্গীতমাধব" ও "গীতামৃত" গ্রন্থ এখন অতীব দুষ্প্রাপ্য। "পদামৃতসমুদ্র," "পদকল্পতরু," "পদকল্প-লতিকা" প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সংগ্রহ-পুস্তকে গোবিন্দদাসের পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত একান্নটী পদ-সংযুক্ত "একান্নপদ" গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

গোবিন্দদাসের জীবনী সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু আমরা জানিতে পারি নাই। লেখক মহাশয়ও বেশী কিছু বলেন নাই। লেখক একস্থানে বলিতেছেন, "ইনি চৈতন্যের জন্মের ৮২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায় বা ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।" আমাদের বিবেচনায় চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের অল্পদিন পরেই গোবিন্দদাসের জন্ম হইয়াছিল। "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দদাসের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং "নরোত্তমবিলাসে" লিখিত আছে, বৃন্দাবনে ইঁহাদের পর-স্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ১৫৩৭ শকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হয়। * এই সময়ে কৃষ্ণদাস

---

* শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অতিশয় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাসকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমকালীন লোক বলিয়া স্থির করিলে, শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ ১৪৮০ শকাব্দায়, কি তাহার দুই চারি বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সনাতন গোস্বামী "বৈষ্ণবতোষণী" গ্রন্থ ১৪৭৬ শকাব্দায় রচনা করেন। * ইহার পরেও তিনি কিছুদিন সম্ভবতঃ ১৪৯০ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রিয়সুহৃৎ নরোত্তম ঠাকুর যখন যৌবনের প্রথম অবস্থায় বৃন্দাবনে ভক্তমণ্ডলীতে আসিয়া মিলিত হন, তৎপূর্ব্বেই রূপ ও সনাতন গোস্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে ১৫০০ শকাব্দায়—কি ২।৪ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সময়ে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পদাবলী রচনাতে নিযুক্ত হন বলা যাইতে পারে। কেবল গোবিন্দদাস কেন, জ্ঞানদাস, শিবরামদাস, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, কবিচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শুন শুন নিরদয়হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই—ইত্যাদি।

যে পদটী টিপ্পনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তে

প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান।

এই ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, গোবিন্দদাস নামে কোন কবি যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। কোন কোন কবিতার শেষে "রায় বসন্ত মধুপ আন-

* "সজ্জনতোষণী" ২য় খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা।

ন্দিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ" ইত্যাদি ভণিতা পাঠ করিলে এই অনুমান যে নিতান্ত অমূলক তাহা বোধ হয় না। রায় বসন্ত বা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন,ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই বসন্তরায় একজন কবি ছিলেন, এরূপ প্রবাদও শ্রুত হওয়া যায়। "নরোত্তমবিলাস" পাঠে জানা যায় মহাকবি বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। * ইঁহাকে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় বলিয়া অসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত করা যাইতে পারে, এরূপ নিশ্চিত প্রমাণ আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। গোবিন্দদাসের কবি-তাতে প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের নাম এবং বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাসস্বরূপ নরহরিদাসপ্রণীত নরোত্তমবিলাসে মহাকবি বসন্তরায়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, বসন্তরায় ও বুধরী-নিবাসী গোবিন্দদাস এক সময়ের লোক ও উভয়ে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন।

"ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "প্রতা-পাদিত্য, স্বীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় পুত্রকেও হত্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্ঞী নানা কৌশলে ঐ যুবকের জীবন রক্ষা করেন। একবার কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়াতে, তিনি কচু রায় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অবশেষে কচু রায় পলায়ন করিয়া সম্রাটের শরণাগত হইলেন। তৎকালে সম্রাট জাঁহাগির দিল্লির রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি প্রতাপা-

* জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্তরায়।
সদাময় রাধাকৃষ্ণ চেতনালীলায়॥
নরোত্তমবিলাস, দ্বাদশ বিলাস।

দিত্যের নৃশংস ব্যবহারে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার দমনার্থে রাজা মানসিংহকে পাঠাইলেন।" * এই সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দার নানা প্রকারে রাজা মানসিংহের সহায়তা করায় মানসিংহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৪টী পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর উক্ত জমিদারীর ফরমাণ বা রাজসনন্দ ভবানন্দকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ফরমাণের তারিখ হিজরী ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৬০৬ † ১৫২৮ শকাব্দ। ইহার পূর্ব্বে বৃদ্ধাবস্থায় বসন্তরায় নিহত হইয়াছিলেন। বসন্তরায় ও গোবিন্দদাসকে সমসাময়িক বলিয়া ধরিলে ১৫০০ শকাব্দার কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দদাস পদরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাসের পদাবলীতে হিন্দীশব্দের অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মাধুর্য্য, শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং বর্ণনার সৌন্দর্য্যে তাহা অতিশয় প্রীতিপ্রদ; অনেকস্থলে ভাবের গভীরতাও যথেষ্ট আছে।

লেখক মহাশয় অপর তিনজন গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে গীতরচয়িতা বলেন নাই; সুতরাং আমরা তাঁহাদের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা আর দুইজন গোবিন্দের নাম পাইয়াছি। একজনের নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ইনি নরোত্তম ঠাকুরের ভবনে ভক্তসহবাসে থাকিয়া নাম সংকীর্ত্তন সাধনভজন করিতেন, এইমাত্র জানা যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম গোবিন্দ-

---

* ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত অন্নদামঙ্গল দেখ।

† ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত ৮০ পৃষ্ঠা।

দাস। ইঁহার নিবাস উত্তর রাঢ়। রথযাত্রার সময়ে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রতিবৎসর চৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করিতেন। এ ব্যক্তি সেই সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধেও আর কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। *

আমাদের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমরা এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে,—(১) চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ে গোবিন্দদাস নামে কোন বঙ্গীয় কবি ছিলেন না। (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গীতগোবিন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রধান কীর্ত্তনগায়ক গোবিন্দঘোষ পদরচয়িতা হইলেও তাঁহারা স্বীয় স্বীয় নামেই আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে গোবিন্দদাস নামে অভিহিত করা যায় না। (৩) চৈতন্যের অন্যতম সঙ্গীতশিষ্য গোবিন্দানন্দ ভাগবত ও গোবিন্দ দত্তকে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলা যাইতে পারে এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে গিরীশ্বরনন্দন গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত একটী পদ দেখিয়া অনুমান হয়, ইনি একজন গানরচয়িতা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। (৪) বুধরীনিবাসী শ্রীনিবাসশিষ্য গোবিন্দ কবিরাজই দেশবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস। (৫) রায়বসন্ত গোবিন্দদাসের সমকালীন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী একজন প্রধান কবি ছিলেন, ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

আমরা অনেক পরিশ্রম করিয়া এ সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা জ্ঞাত হইতে পরিয়াছি, সহৃদয় পাঠকদিগের নিকটে তাহা উপস্থিত করিলাম। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এদেশে চিরকাল কল্পনার

* প্রেমানন্দ দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্ক।

অন্ধকার গহ্বরে প্রচ্ছন্ন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যদি কেহ আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব।

ডাক্তার বাবু।

রামদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য, বয়সে নবীন, ব্যবসায়ে ডাক্তার। নিজ বল্লভপুরে এবং তাহার আশেপাশে, রামদাসের ভারি পশার, ও অঞ্চলে নাকি তার জোড়াটী মিলে না। কিন্তু কেবল ডাক্তারীই তার গুজরান নয়, সে বহুরূপী। যখন হুঁকাহাতে, খালি গায়ে, শুধু পায়ে, "মাঠ তদারকে" বাহির হয় তখন সে দাদাঠাকুর, যখন কপালে চন্দন, কাঁধে নামাবলি, হাতে নৈবেদ্য, তখন "পুরুত ঠাকুর, আবার যখন পোষাক অাঁটা, ঘোড়ায় চড়া তখন ডাক্তার বাবু! তার আরও রূপ আছে, যখন ঢুলু ঢুলু নয়নে, স্খলিত বসনে, চঞ্চল চরণে কেলুসার দোকান হইতে বাহির হয়, তখন সে অপরূপ!

কিন্তু এহেন রামদাস চরিতামৃতের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে লইতে গেলে একটু পূর্ব্বাভাষের প্রয়োজন। রামদাসের পিতা ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস নয় বৎসর বয়সেই পিতার সহকারীরূপে ব্রতী হন। দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রামদাস। বল্লভপুরের 'গুরুমশায়' যখন জানাইলেন, রামদাসকে আর তিনি পাঠশালায় রাখিতে পারেন

না, ত্রিলোচন তখন পুত্রের পরিণাম চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন! এইরূপে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অকস্মাৎ সম্মুখে কূল দেখিতে পাইলেন। তাঁর এক যজমানের বন্ধুর জামাতা, সুকুমার মৈত্র কলিকাতায় ডাক্তারী করেন। সুকুমার বাবু শশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, শশুরের অনুরোধে, ত্রিলোচনের আশীর্ব্বাদে বদ্ধ হইয়া, রামদাসকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন; সুকুমার বাবুর ক্ষুদ্র পরিবার—বন্দোবস্ত হইল, রামদাস তাঁর বাসায় রাঁধিবে, আর সুবিধা ও সাবকাশমত পড়াশুনা করিবে। রামদাস এ প্রস্তাবে মহাখুসী, পাড়াগাঁয়ের যে মজা সে ত তা লুটিয়াছে, এখন সহরের আস্বাদটা আর বাকি থাকে কেন? মহা উৎসাহে রামদাস নিজের ক্ষুদ্র পুঁটুলীটা কোমরে বাঁধিয়া সবে এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। নিজের কলি হুঁকাটী লইতে ভুলিল না, কিন্তু মনের আনন্দে,বাপ ভাইকে বিদায়ের প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল।

সুকুমার বাবু রামদাসের গুণগ্রামের পরিচয় কিছু পূর্ব্বে পান নাই, একে একে তিনি দেখিলেন, রামদাস বিনা লবণে দাল রাঁধিতে পারে, ঝাল ব্যতীত মাছের ঝোল রাঁধে, তেল না হইলেও ভাজাভুজিতে তার আপত্তি নাই। প্রায়ই যেখানকার ঝালমসলা লবণ সেখানেই পড়িয়া থাকে, রামদাস এদিকে অবাধে ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া যায়। এইরূপে ডাক্তার বাবুর দিনে দিনে আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল, বুঝি বা শাপভ্রষ্ট নলরাজা, প্রচ্ছন্ন বেশে পাচকরূপে, তাঁহাকে ছলিতে আসিয়াছেন!

সুকুমার বাবু তাঁর পুত্র বিমলচন্দ্রকে বলিয়া দিলেন যেন তিনি রামদাসকে কিছু কিছু পড়ান। বিমল তাহাকে বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠা পড়াইতে পড়াইতে দেখিলেন, তাঁহার ছাত্রের বিশেষ-

রূপে বোধোদয় হইয়াছে! উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, "কেন কেঁচো"। উত্তর শুনিয়া বিমল হাস্য সম্বরণ করিতে না পারায় রামদাস তর্ক ধরিল, বুঝাইল, যাহা মাটী ভেদ করিয়া উঠে, তাহাই যদি উদ্ভিদ, তবে কেঁচো কেননা উদ্ভিদ হইবে?

আজ যাহা পড়িল, কাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "বিলক্ষণ, ও যে পুরোনো পড়া"। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে রামদাস বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিল. এদিকে বিমল ক্রমে তাহার ছাত্রের বিদ্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। নিজের বিলসরকারী কাজটী দিলেন। নূতন পাচক নিযুক্ত হইল। রামদাসের উন্নতি হইল। বেতন তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকায়, বয়স সতের হইতে উনিশে, নেশা তামাক ছাড়াইয়া—ছাড়িয়া নয়—মদে উঠিল। তাহার সেই পল্লীগ্রামের চক্ষু, পক্ষীকুলায়ে ডিম্বের মত, এতদিন কলিকাতার বাসায় আবদ্ধ ছিল, অকস্মাৎ বাহিরের তাপ পাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে এখন চটি ছাড়িয়া বুট ধরিয়াছে, চাদর রাখিয়া সার্ট পরিয়াছে, বেড়ি ফেলিয়া ছড়ি ধরিয়াছে! এইরূপে বিলসরকারী করিতে করিতে অকস্মাৎ তার সেই উর্ব্বর মাথায়, আলবার্টের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ফন্দি জাগিয়া উঠিল। সে তখন নানা উপায়ে কম্পাউণ্ডারের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা পাইল, চেষ্টা বিফল হইল না। সে একে একে কয়টা ঔষধের নাম জানিয়া লইল, ফিবার মিক্‌শ্চার, কুইনাইন মিকশ্চার, তাও করিতে শিখিল। মাস কয়েকের মধ্যে সে বুঝিল, ডাক্তারী শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে আর তাহার বড় বাকি নাই!

ইহার মধ্যে একদিন শুনা গেল, ডাক্তার বাবুর একশেট অস্ত্র, একটা ষ্টিথস্‌কোপ, আর একটা থরমোমেটর পাওয়া যাইতেছে না!

... ...

পিতার সংশয়াপন্ন অবস্থা জানিয়া—হঠাৎ রামদাসকে বাটী যাইতে হইল। সে গিয়াই পিতার নাড়ি টিপিল তার পর মুখ গম্ভীর করিয়া, দাদাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিল, কেন তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইল না; সে নিজে ডাক্তার থাকিতে, তাহার পিতাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে হইল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? রামদাস তবু হাল ছাড়িল না, সে কাগজ কলম লইয়া, তাড়াতাড়ি বাঙ্গলায় প্রিস্‌কিপ্‌সন লিখিতে বসিল, দশ ক্রোশ দূর হইতে ঔষধ আনাইতে হইবে। ত্রিলোচন, এই অন্তিম কালে ডাক্তারী ঔষধ সেবনে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রামদাস "প্রেজুডিস" বলিয়া, নাক সিট্‌কাইয়া, অধিকতর গম্ভীরভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসিল। ত্রিলোচন অনিমিষলোচনে পুত্রের সেই পাণ্ডিত্যগর্ব্বিত বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—ছেলে আমার ডাক্তার হয়েছে তবে আর "করে' খাবার" ভাবনা নাই! তখন বৃদ্ধের আনন্দাশ্রু বহিল, পার্শ্বে ও নিকটে যজমান যে দুচারি জন ছিল, তারা ভাবিল, "ছোটদাদা ঠাকুর আমাদের ডাক্তারীতে ভারি লায়েক হয়েছে।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে ত্রিলোচনের শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইল, ঔষধ আনিবার নিমিত্ত লোক গ্রামের বাহির হইতে না হইতে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল!

তার পর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া রামদাস আবার কলি-

কাতায় ফিরিল। যাইবার সময় গ্রামের লোককে আশা দিয়া গেল, আর "বিনা চিকিৎসায়" কাহাকেও মারা যাইতে হইবে না!

বাড়ী হইতে আসিয়া রামদাস মাস খানেক বিলসরকারী করিল। একদিন রাত্রে বিল আদায় করিয়া আনিয়া, সে ডাক্তার বাবুর পা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ব্যাপারখানা জানিতে চাহিলে বলিল, "বিল আদায় করে আন্‌চি, আর মেছোবাজার ষ্ট্রীটে তিন বেটা কাফ্রি আমার কাছ হ'তে ৩৭৸৵০ সাইত্রিশ টাকা দশ আনা ছিনিয়ে নিয়েছে।" টানাটানিতে সার্ট ছিঁড়িয়াছে, তাও দেখাইল, তাদের হাতে তার নানারূপ দুর্দ্দশা হওয়ার কথাও জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিল, শেষে বলিল, কেবল ডাক্তার বাবুর পুণ্যেই সে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে, ভাগ্যে যেই তার চীৎকারে লোক জড় হয়েছিলো তাই প্রাণে প্রাণে বেঁচেছে। বুকপকেটে যে একখানা বিল ও পাঁচটাকার নোট ছিল, তা কিন্তু নিতে পারেনি। ডাক্তার বাবু এ ঘটনা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না ঠিক জানি না, কিন্তু সে জন্য কিছু বলিলেন না— রামদাস নিজেই বলিল, সে আর এ কাজ করিবে না—প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে তবে ত উপার্জ্জন। রামদাস তার পরদিন হইতে বিলসরকারী ছাড়িয়া দিল, এবং অন্য কাজকর্ম্মের চেষ্টার জন্য ডাক্তার বাবুকে বিশেষ রূপে ধরিল।

দিন কত পরে রামদাসের বাটী হ'তে এক পত্র এসে উপস্থিত! দেশে অনেকগুলি যজমান, তা ছাড়া সংসারের কাজকর্ম্মও আছে, দাদা আর একা পেরে উঠ্‌ছেন না। যথাসময়ে এ পত্র ডাক্তার বাবুকে দেখান হইল, তিনি রামদাসের প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। রামদাস কিন্তু আরও দুই দিন কলিকাতায়, স্থানান্তরে রহিল, সে বড়বাজার

হইতে ফাইল চার কুইনাইন আর টাকা কয়েকের অন্য অন্য ঔষধও কিনিল। তারপর সেকেণ্ডহ্যাণ্ডের দুইখানা চেয়ার, একটা আলমারি, ও একটা টেবিলও লইল। কোট পেণ্টু-লেন, একটা পুরান ঘড়ি, কেমিকেল গোল্ডের একছড়া চেনও কিনিতে ভুলিল না। ডাক্তারীর অন্য অন্য যে উপ-করণ সে তা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিতেছিল। একখানা বাঙ্গলা ও আর একখানা ইংরাজি সাইনবোর্ড করাইল, ইংরাজিতে R. D. Bhatta M. P. * এবং বাঙ্গলাতে ডাক্তার রামদাস ভট্টা-চার্য্য এম, পি লেখাইয়া লইল। ছোট বড় অনেকগুলি শিশি এবং বোতল, ছোট ছোট কয়টা সেল্ফ, কিছু লাল নীল রংও সংগ্রহ করিয়াছে। বাটীতে বাহিরের ঘর পরিষ্কার করিয়া, দেয়াল কাটিয়া, দুইটা আল্মারি করিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করিয়া আসিয়াছিল। রামদাস গ্রামে পা দিতে না দিতে তাহার পোষাকের ছটা, আর আস্‌বাবের ঘটা দেখিয়া দেশে একটা বিষম হৈচৈ উঠিল। তার পর, আবার সে যখন, খালি শিশি ও খালি বোতল রঙ্গিন জল পুরিয়া আল্মারি ও সেলফ সাজাইল, সাইনবোর্ট টাঙ্গাইল তখন একটা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। কেহ মোড়লদের রকে বসিয়া তামাকু খাইতে খাইতে, কেহ স্নান করিতে করিতে, কেহ হাটে যাইতে যাইতে বলিল, এমন-ধারা দিগ্‌গজ ডাক্তার এ অঞ্চলে আমরা কখনও দেখিনি।

দেশে আসিয়াই রামদাস সায় রেকাব জিন তের টাকায় এক ঘোড়া কিনিল! এখন রামদাসের চিকিৎসার পালা! রাম-দাসকে ডাকিতে হয় না, কাহারো ব্যারাম হওয়ার খবর পাইলেই

---

* Medical Practitioner.

সে ধড়া আঁটিয়া চেন ঝুলাইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়। রামদাস যখন রোগীর নাড়ি টিপিয়া, দশনে অধর পীড়িত করিয়া, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রোগীর বিবরণ শুনে, তখন কাহার সাধ্য ঠিক করে, ইনি এম-বি, কি এম-ডি! রামদাস বোতল বোতল ঔষধ দেয়, সময়ে সাবু মিছরিও যোগায়, কিন্তু দামের বেলায়, রামদাসের কড়াকড়ি নাই। কেহ আট দশ গণ্ডা পয়সা, কেহ পাঁচ সাত পালি চাল, কেহ ধান, কেহ গুড়, যে যা দেয়, রামদাস হাসিহাসি মুখে তাহাই লয়! রোগী যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, রামদাস তখন তাহার সাক্ষাতে সোডা এসিড তৈয়ার করিতে বসে! ফোঁস ফোঁস শব্দ মাত্র রোগীকে উল্লেখ করিয়া বলে, ভাইরে যেমন জোর দেখ্‌চো, ভিতরে গিয়েও ঔষধের এমনি জোর ধরিবে। শুনিয়া রোগী অবাক হইয়া যায়, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হয়! কাহারো হাত কি পা ভাঙ্গিয়া গেলে রামদাস তৎক্ষণাৎ হাওড্রাকসেন হয়েছে, ফ্রাকসান করিলেই ভাল হইবে বলিয়া জলপটি বাঁধিয়া দেয়! অস্ত্রবিদ্যাতেও রামদাস বিশেষ হাত দেখাইতে লাগিল! এইরূপে অচিরাৎ রামদাসের পসারে দেশ ছাইয়া উঠিল; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে একটা ধিধি, একটা ঢিঢি পড়িয়া গেল!

রামদাস আর না ডাকিলে যায় না, টাকা বৈ সিকি আধুলি লয় না! চাল ধান খড়ে আর তার তেমন রুচি নাই!

সুকুমার বাবুর শ্বশুরবাটী যে গ্রামে, একদিন সেখান হইতে রামদাসের একটা ডাক আসিল। রামদাসের আর একটা ডাক ছিল, সেইটা সারিয়া আসিতে তার কিছু বিলম্ব হইল। তার পর রামদাস সেই রোগীর বাড়ী গিয়া দেখে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে, সর্ব্বনাশ, স্বয়ং সুকুমার বাবু!

হঠাৎ পকেটস্থ ষ্টিথস্‌কোপ ও থারমোমেটারের দিকে রামদাসের নজর পড়িল, বুঝি, প্রাণটা তার কেমন করিয়া উঠিল!

সম্মুখে তীব্র আলোক দেখিলে উর্দ্ধফণা অহিবিষ যেমন থমকিয়া দাঁড়ায়, অথবা অজাগর সম্মুখে পক্ষীকুল যেমন নিস্পন্দ হইয়া যায়, প্রথম সাক্ষাতে সুকুমার বাবুর সম্মুখে রামদাসেরও সেই দশা ঘটিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্যপুত্র রামদাস একেবারে বোকা বলিবার পাত্র নহে, সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া, ষ্টিথস্‌কোপটাকে পকেটের এক প্রান্তে রাখিল। তারপর তাড়াতাড়ি, হাসিহাসি মুখে সুকুমার বাবুকে সাহেবি ধরণে নমস্কার করিল, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেও কসুর করিল না। সুকুমার বাবু অভ্যাসবশতঃ প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু হঠাৎ রামদাসকে বড় একটা চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না, তারপর যখন চিনিলেন—তখন বলিয়া উঠিলেন—"আরে কেরে, রামদাস, তুই কোথা থেকে রে"—পার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল—"এজ্ঞে উনি আমাদের বল্লভপুরের ডাক্তার বাবু।"

সুকুমার বাবু নির্জ্জনে রামদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাঁহার কাছছাড়া হইয়া রামদাস কোথাও ডাক্তারী কিছু শিখিয়াছিল কি না তাও সুধাইলেন; রামদাস দুই চারিটা কথা লুকাইয়া সমস্তই জানাইল; আরও বলিল, আপনার কম্পাউণ্ডারের নিকট যে দুই একটা রোগের চিকিৎসা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই রোগ কটার চিকিৎসার সময়ই একটু একটু গোল বাধে, মনে হয়, যেন ভুল হইতেছে, কিন্তু বাকি সকল রোগের চিকিৎসাই চক্ষু বুজিয়া অনায়াসে করিয়া যাই। সুকুমার বাবু যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন "যাই করিস্ দেখিস্ যেন বাড়ীর বা আত্মীয় বন্ধুর চিকিৎসা করিস্‌নে"—তার উত্তরে রামদাস

বলিয়াছিল, "আজ্ঞে না—মাতাঠাকুরাণীর কাল হওয়া পর্য্যন্ত আর আপনার লোকের চিকিৎসায় হাত দিই না"।

বীণা।

১

অন্ধকার শব্দহীন জড় কারাগারে
রুদ্ধ এ পরাণ মোর,
সূর্য্যের কিরণ কভু পশিয়া সেথায়
করে না আঁধার ভোর।
সঙ্কীর্ণ এ কারামাঝে শুধু আমি আছি,
আর কিছু সেথা নাই;
অনিরুদ্ধ পথ বেই সর্ব্বগ আকাশ
তাহাও না পায় ঠাঁই।
জড়বৎ পড়ে' আছি জড়ের মাঝারে,
বুঝিতে পারিনে ভাল—
অন্ধকার শব্দহীন কারার বাহিরে
আছে কি সঙ্গীত আলো?
আছে কি সৌন্দর্য্য প্রেম, পূর্ণ স্বাধীনতা,
অনন্ত অসীম আশা?
ব্যক্ত করিবার তরে ব্যাকুল বাসনা,
আছে কি কোথাও ভাষা?

হৃদয়ের গান যেথা জড় প্রতিঘাতে
কাঁদিয়া আসে না ফিরে ;
অচেতন জড় বাধা না পারি ভাঙ্গিতে,
কাঁদে না হৃদয়তীরে ?
আছে কি সে স্থান যেথা অসীম আকাঙ্ক্ষা
ক্ষুদ্র অসীমের মাঝে
প্রতি পদে বাধা পেয়ে, চির কারারুদ্ধ,
আপন মর্ম্মে না বাজে ?

২

মাঝে মাঝে একদিন না জানি কেমনে
কোন্ মায়াবী কুহকে,
কোথা হতে হৃদিমাঝে সৌন্দর্য্য পশিয়া
ভরিয়া দেয় পুলকে !
প্রেয়সীর করস্পর্শ যেন দেহপরে
স্বপনে পড়ে গো আসি',
প্রেয়সীর প্রেমদৃষ্টি বিরহী নয়নে
সহসা আসে গো ভাসি'।
যেমন লুকান প্রেম ফুলের হৃদয়ে
লাগি' সন্ধ্যার বাতাস
মধুর সৌরভরূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে
নিজেরে করে প্রকাশ।
এ কুহকবলে মোর অন্ধকারাগার
আপনি টুটিয়া যায় ;
উন্মুক্ত পরাণ মোর সঙ্গীত আকারে
জগৎ প্লাবিয়া দেয়।

মহাকাশ ব্যাপ্ত করি'   ভরি' চন্দ্রালোক
ভ্রমি' তারায় তারায়,
আলোকের বহির্দ্দেশে   মহাশূন্য যেথা
অশ্রান্ত ছুটি বেড়ায়।

৩

সহসা ভাঙ্গিয়া যায়   কুহক ক্ষমতা
স্বপনের মায়াসম,
সহসা আবার দেখি   জড় কারাগারে
আবদ্ধ হৃদয় মম।
মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ   বিদ্যুৎ যেমন
সব টুটি' বাহিরায়,
এক মুহূর্ত্তের তরে   জগৎ চমকি'
অন্ধকারে মিশে যায়,
তেমনি এ প্রাণ মম   ক্ষণেকের তরে,
না জানি কিসের বশে
সকল বন্ধন ভাঙ্গি   বাহিরিয়া হায়,
পুনঃ কারাগারে পশে।
আবার আবার হায়   সেই কারামাঝে
রুদ্ধ এ পরাণ মোর,
আশাহীন প্রাণ শুধু   অনুভব করে
ভীষণ আঁধার ঘোর।
মাঝে মাঝে ভ্রম হয়   জড় ছাড়া বুঝি
জগতে কিছুই নাই,
আমি যেন আমি নই   জড়ের পীড়নে
জড় মাঝে মিশে যাই।

৪

কবি,

তোর এই দেহমাঝে জড় কারাগারে
অবরুদ্ধ যে পরাণ,
তোরেও শুধাই আমি জানিস্ কি তুই
কেমনে কে গাহে গান ?
অশরীরী হয়ে যবে কামরথে চড়ি'
তুলিস্ স্বর্গের ফুল,
বলিতে পারিস্ তুই কাহার কুহকে
ছাড়ি' সীমাবদ্ধ কূল
অসীমের রাজ্যপানে উড়ে চলে যাস্
অনন্তে হইতে হারা!
সৌন্দর্য্যের রাজ্যমাঝে প্রবেশি, হইতে
প্রেম মদে মাতোয়ারা ?

কবি,

বীণার (ই) মতন তুই! কেমনে কে জানে
কোন্ নিরুদ্দেশ হতে
কাহার কুহক তোরে ভাঙ্গি' কারাগার
নিয়ে যায় স্বর্গপথে!

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সম্মোহন-তত্ত্ব।

আজকাল সম্মোহন-তত্ত্ব লইয়া য়ুরোপে খুব আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম, মেস্মের্ নামক একজন পণ্ডিত এই বিষয়ের

আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন, একপ্রকার তরল পদার্থ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে—সেই পদার্থ মানব-দেহেও বর্ত্তমান। এই পদার্থ যাহার শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আছে, সে আপন অপেক্ষা হীনতর ব্যক্তির উপর প্রভাব প্রকটন করিয়া তাহাকে বশ করিতে পারে—সেই প্রভাবের নাম তিনি "প্রাণীদেহের চুম্বক-শক্তি" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এ কথা বড় মানিতে চাহেন না—মেস্‌মেরিজমে যে একটা রহস্যময় আবরণ ছিল, সেই আবরণটি উদ্ঘাটিত করিয়া, ভেল্কির রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, উহাকে তাঁহারা চলিত ঘটনার সামিলে আনিতে চাহেন। তাই মেসমেরিজমের পরিবর্ত্তে তাঁহারা হিপ্‌নটিজম এই শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হিপ্‌নটিজমের ঠিক্ অনুবাদ—সুপ্তিতত্ত্ব। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি যেরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার ইহাও তদনুরূপ। ফলতঃ ইহা একপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে নিদ্রা বা স্বপ্ন প্রবর্ত্তন করা। এ নিদ্রা একপ্রকার সজাগ নিদ্রা এবং ইহা কতকটা স্নায়ু-বিকারের ফল। তাই হিপ্‌নটিজমের অনুবাদে উপসুপ্তিতত্ত্ব বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

মেস্‌মেরিক সম্মোহনে, মুখের সাম্‌নে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রা আকর্ষণ করাই চলিত পদ্ধতি—কিন্তু আধুনিক উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকেরা এ পদ্ধতিটি বড় অবলম্বন করেন না।

উপসুপ্তি সঞ্চার করিবার তাঁহাদের দুইপ্রকার প্রণালী আছে। দুইটি পরীক্ষা-বিবরণ এস্থলে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেই পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন সেই দুই প্রণালী কিরূপ। জর্ম্মান পণ্ডিত মল পরীক্ষা করিতেছেন।

(১) "২০ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের উপর পরীক্ষা করিতেছি। তাহাকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিলাম এবং তাহার হস্তে একটা বোতাম দিয়া বলিলাম—এই বোতামটির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক। তিন মিনিটের পরে তাহার চোখের পাতা ঢলিয়া পড়িল; হাজার চেষ্টা করিয়াও চোখ খুলিতে পারিল না! এতক্ষণ বোতামটি সে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল—এক্ষণে তাহার হস্ত শিথিল হইয়া হাঁটুর উপর এলাইয়া পড়িল। আমি তাহাকে বলিলাম তুমি কিছুতেই চোখ্ মেলিতে পারিবে না—সে চোখ্ মেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু পারিল না—ইত্যাদি।

(২) "একজন ৪১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি চৌকিতে বসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ক্রমাগত এই ভাবো যে তোমার ঘুমাইতে হইবে—এ ছাড়া আর কিছু ভাবিও না। এখন তোমার চোখ বুজিয়া আসিতেছে; তোমার চোখের পাতা ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। তোমার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিতেছে—তোমার সমস্ত দেহে শ্রান্তি বোধ হইতেছে, একটা ভার বোধ হইতেছে, একটা ঘুমের ভাব আসিতেছে—এই তোমার চোখ্ বুজিল; তোমার মাথায় জড়তা আসিতেছে—তোমার চিন্তা সকল ক্রমশঃ গোলমেলে হইয়া আসিতেছে। আর তুমি ঘুম চাপিতে পারিতেছ না—এই তোমার চোখ্ বন্ধ হইল—এখন ঘুমাও। সে চক্ষু বুজিলে আমি তাহাকে বলিলাম, এখন চোখ খুলিতে পার কি? (চোখ্ খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু পারিল না) আমি তাহার বাম হস্ত তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলাম। (হাত সেইখানেই রহিল, হাজার চেষ্টাতেও হাত নাবাইতে পারিল না)।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘুমাইয়াছ কি? উত্তর—হাঁ ঘুমাইয়াছি। একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছ?—উত্তর—হাঁ। ঐক্যতান বাদ্য শুনিতে পাইতেছ কি? উত্তর—"পাইতেছি বৈকি"। একটা কাল কাপড় তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম—এইটা যে কুকুর হাত দিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছ তো? উত্তর "স্পষ্ট পারিতেছি"। এখন তুমি চোখ্ খুলিতে পার—চোখ্ খুলিলে কুকুরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহার পর তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে এবং যতক্ষণ না আমি বলিব ততক্ষণ আর উঠিবে না। (সে চোখ্ খুলিল, কল্পিত কুকুরের পানে তাকাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল) আমি সেই কাল কাপড়টা তাহার হাত হইতে লইয়া মাটিতে বিছাইয়া দিলাম। (সে দাঁড়াইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে লাগিল।) তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম যে,সে এক্ষণে পশু-শালার উদ্যানে আছে—যদিও আমার ঘরে ছিল, সে তাহাই বিশ্বাস করিল—বৃক্ষাদি দেখিতে লাগিল ইত্যাদি।"

অতএব দেখা যাইতেছে প্রথম প্রণালীতে একটা বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোনিবেশ করিতে বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে ঘুমের ভাব কথার দ্বারা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের যোগীরা ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া আপনাকে আপনি এইরূপে সম্মোহিত করিতেন—ইহাকে স্বকৃত-উপসুপ্তি বলা যাইতে পারে। উপসুপ্তি-তন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্চে উপসুপ্তাবস্থায় কোন উপায়ে কল্পনা উত্তেজিত করিয়া দেওয়া—কথা কিম্বা ভাব-ভঙ্গির দ্বারা কোনপ্রকার ধারণা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। তৎকালে মনে যে ধারণার উদ্রেক হয় তাহাতেই ধ্রুববিশ্বাস জন্মে— এবং উপসুপ্ত ব্যক্তি সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে।

উপসুপ্ত ব্যক্তি উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের কথার নিতান্ত বাধ্য—তিনি যাহা বলেন সে তাহাই করে। স্বকৃত উপসুপ্তির আর এক দৃষ্টান্ত—মন্দির-প্রাঙ্গণে রোগী ব্যক্তির স্বপ্নৌষধ-লাভ। আমাদের এখানে তাড়কেশ্বরের মন্দিরে রোগীরা হত্যা দেয়—হত্যা দিয়া কখন কখন স্বপ্নৌষধি লাভ করে। সেই স্বপ্নৌষধিতে যে উপকার হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। পুরাকালে গ্রীকদিগের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রোগী ব্যক্তি নিরশন থাকিয়া এক মনে আপনার শারীরিক অবস্থার বিষয় ভাবিতে থাকে—অধিক কাল নিরশন থাকিলে একটু না একটু স্নায়ু-বিকার স্বভাবতই উপস্থিত হয়—তাহার উপর আবার একাগ্রচিন্তা—ইহাতে করিয়া উপসুপ্তাবস্থা সহজেই উৎপন্ন হয়; এই সময়ে যে ঔষধির বিষয় স্বপ্ন দেখা যায় তাহাতে সহজেই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মে। এইরূপে যে ঔষধ ধ্রুববিশ্বাসের সহিত সেবন করা যায় তাহাতে রোগ আরোগ্য হইবারই কথা। আজকাল য়ুরোপের ডাক্তারেরা উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তন দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। যে সকল রোগ স্নায়ু-ঘটিত তাহাই বিশেষরূপে এই পদ্ধতির দ্বারা প্রশমিত হয়। অনেকের পানরোগ এই পদ্ধতির দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধারণা উদ্রেক করিয়া দেওয়াই উপসুপ্তি-তত্ত্বের মূলমন্ত্র—সেই ধারণা যে শুধু উপসুপ্তাবস্থাতেই থাকে তাহা নহে—উপসুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেলেও সেই ধারণা কাজ করে। মনে কর, উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তক উপসুপ্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তোমার মদ ভাল লাগে না—না?—সে বলিল "না"। তুমি জাগ্রত হইলেও তোমার মদ ভাল লাগিবে না—না? সে বলিল "না"। বাস্তবিকও সে জাগিয়া উঠিয়া এই ধারণানুসারেই কাজ করে।

তাহার মদ খাইতে আর ভাল লাগে না। উপসুপ্তিতত্ত্বে এইরূপ ধারণার উদ্রেককে উত্তর-ধারণার উদ্রেক বলে। যাহার প্রকৃতিতে ধারণার উদ্রেক-শীলতা অধিক, সেই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার অনুকূল পাত্র। সকল প্রকৃতিতে উপসুপ্তি সমানরূপে কার্য্যকরী হয় না। অনেকে মনে করে, যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের ইচ্ছার জোর নাই তাহারাই বুঝি সহজে উপসুপ্তির অধীন হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে। যাহারা মনস্থির করিতে পারে, একাগ্রচিত্ত হইতে পারে তাহাদের উপরেই বরং এই প্রক্রিয়া অধিক ফলবতী হয়। উপ-সুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপ লোকের মনকে ভালর দিকে লইয়া যাওয়া যায় সেইরূপ খারাপ দিকেও প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। এই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা য়ুরোপে মধ্যে মধ্যে বদ্‌মাইশিও হইয়া থাকে। আদালতের বিচারে অনেক সময়ে প্রকাশ হইয়াছে যে,কোন ব্যক্তি উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের আদেশক্রমে কোন বদমাইশি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্বেচ্ছাক্রমে সে কাজ করে নাই। কিরূপ আইন করিলে এই প্রকার ঘটনা নিবারণ হইতে পারে সেই বিষয়ে য়ুরোপে আজ কাল্ আন্দোলন চলিতেছে। সম্মোহন-তত্ত্বকে এখন আর গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জর্ম্মনি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় সেইরূপ উপসুপ্তিতত্ত্ব বিষয়েও রীতিমত বক্তৃতা হইয়া থাকে।

ভাষা শিখিবার হদিশ।

মসিয়ো গুয়াঁ নামক এক জন ফরাসিস পণ্ডিত, "ভাষা শেখা ও শিখাইবার হদিশ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া-

ছেন। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি বলেন, দুই তিন বৎসরের শিশুরা যে-কোন বিদেশীয় ভাষা ছয় মাসের মধ্যে শিখিতে পারে। তাহারা ব্যাকরণ পড়ে না, বর্ণমালাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, কথা বানান করিতে পারে না—কিন্তু চলন-সই কথা কহিতে পারে ও বুঝিতে পারে। নিতান্ত অবোধ শিশু যদি ছয়মাসের মধ্যে একটা বিদেশীয় ভাষা শিখিতে পারে, তবে একজন পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে কেন না শিখিতে পারিবে? তাহার সহজ উত্তর এই। শিশু কান দিয়া কথা শেখে এবং চোখ্ দিয়া যাহা দেখে তাহার সহিত শোনা-কথাগুলি মিলাইয়া লয়। শিশু ঘটনাগুলি চক্ষে দেখে এবং তদর্থবাচক কথাগুলি কানে শোনে; এবং এই দুই প্রকরণ একত্র হওয়ায় আনুষঙ্গিকতার নিয়মানুসারে, কথা কহিতে ও বুঝিতে সহজেই সমর্থ হয়। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিরা ইহার ঠিক্ উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাহারা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর প্রতিরূপ মনোমধ্যে গ্রহণ না করিয়া চক্ষের দ্বারা কথার প্রতিরূপটি মনোমধ্যে বসাইবার চেষ্টা করে। তাহারা কেবল চোখ্ দিয়া কথাগুলি গ্রহণ করে—ইহাতে কান তাহাদের বড় একটা কাজে আইসে না। অতএব শিশুর পদ্ধটিই ভাষা শিখিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি—গ্রন্থকার ইহা স্থির করিয়া শিশুরা কিরূপে ভাষা শিক্ষা করে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন আলোচনা করিয়া কতকগুলি মূল সূত্র নির্দ্ধারিত করিলেন। এই মূল সূত্রের উপর তাঁহার ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছেন।

সেই মূল সূত্রগুলি এই:—

(১) শিশুরা কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া কথার দ্বারা ভাষা শিক্ষা করে না, পরন্তু পূর্ণাবয়ব বাক্যপরম্পরা দ্বারা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে।

(২) বাক্যের দ্বারা যদি ভাষা শিখিতে হয়, তবে ক্রিয়া-পদের উপরেই বেশি ঝোঁক্ দেওয়া আবশ্যক। কারণ ক্রিয়া-পদটিই প্রত্যেক বাক্যের প্রাণস্বরূপ।

(৩) কতকগুলি বাক্যপরম্পরা মনে রাখিবার জন্য শিশু তদর্থবাচক ঘটনাগুলি যেরূপ পরে পরে ঘটিতে দেখে তাহারই ছবি মনোমধ্যে স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিয়া লয়।

ভাষা-শিক্ষার এই রহস্যটি কি করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল গ্রন্থকার তাহারও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি জর্ম্মণ ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিলেন, জর্ম্মণ ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিলেই তিনি জর্ম্মাণ ভাষা শিখিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে তিনি জর্ম্মাণ ভাষার ব্যাকরণ দশ দিনের মধ্যে একরূপ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু হ্যাম্‌বর্গের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার আচার্য্যদিগের বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। যে ব্যভিচারী ক্রিয়া-পদ-গুলি এত কষ্টে তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহার একটিও তিনি বক্তৃতার মধ্যে ধরিতে পারিলেন না। তাই তিনি মনে করিলেন, ভাষার মূল ধাতুগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এই অভিপ্রায়ে জর্ম্মাণ ভাষার ধাতুগুলি তিনি বিলক্ষণরূপে আয়ত্ত করিলেন। মনে করিলেন এইবার ভাষা-শিক্ষার হদিশ পাইয়াছেন। এক্ষণে উৎফুল্ল হইয়া আবার সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখেন

এখনও পূর্ব্ববৎ—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অতঃপর, এই সমস্ত পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া, তিনি নাপিতের দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, সেখানকার খদ্দেরদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দুই চারিটা দস্তুরমত ভদ্রতার বুলি শিখিলেন, কিন্তু কতকগুলি খাপ-ছাড়া বুলি শিখিয়া বিশেষ কিছু ফললাভ হইল না। এক্ষণে তিনি অভিধানের সাহায্যে গেটে ও শিলরের রচনাবলী হইতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেও বিশেষ কোন কাজ হইল না। বিরক্ত হইয়া অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেন। এবার "অলেণ্ডর্ফ" ধরিলেন। একমাসের মধ্যে অলেণ্ডর্ফের সমস্ত পাঠগুলি শেষ করিলেন, শেষ করিয়াও দেখেন কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেছেন না—সে বিষয়ে এখনও ঠিক পূর্ব্ববৎ। তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্যও হইলেন। তবুও ভাষার হদিশ পাইলেন না। পরে হতাশ হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করি-লেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার একটি আড়াই বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে খুব কথা জুড়িয়া দিল। পাকা পাকা কত কথাই বলিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, এ যেমন অনর্গল ফরাসি ভাষায় কথা কহিতেছে, আমি যদি ইহার মত জর্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে পারি, তাহা হইলে কি সুখেরই বিষয় হয়। এই ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, জীবনের কোন একটি নূতন ঘটনা প্রকাশ করিবার সময় এই শিশুটি কি-প্রকার প্রণালী অবলম্বন করে, তলে তলে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। একদিন তাহার মাতা, তাহাকে যাঁতা-কলের কারখানায় লইয়া যান—শিশুটি তাহার আগাগোড়া তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল ও তদ্বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বাড়ি

ফিরিয়া আসিল। আমি তাহার উপর চোখ্ রাখিলাম, মনে করিলাম, না জানি উহার মনে কিরূপ চিন্তা চলিতেছে, দেখা যাক্ কি করিয়া আপনার মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে। এক ঘণ্টা পরে যাহা যাহা দেখিয়াছিল তাহা সকলের নিকটে বর্ণনা করিবার জন্য সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার গল্প বার-বার করিয়া সকলকে বলিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে কথা একটু আধটু বদল হয়—দুই একটা খুঁটিনাটি ভুলিয়া যায়—মনে করিবার জন্য আবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আইসে। এই প্রকারে, একটা তথ্য হইতে তথ্যান্তরে, একটা বাক্য হইতে বাক্যান্তরে স্বাভাবিক ক্রমানুসারে উপনীত হইতে লাগিল। "তার পর" "তার পর" বলিয়া এক একবার থামিতেছে আর এই অবকাশে কথাগুলা মাথার মধ্যে গুছাইয়া লইতেছে; এবং গুছাইয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই কথাগুলা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে। দেখা গেল, একটি পদের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া থামিতেছিল—সেই পদটি ক্রিয়া-পদ। গ্রন্থকারের হঠাৎ মনে হইল, এইবার ভাষা-শিক্ষার যথার্থ হদিশ পাইয়াছেন। এই হদিশটি তিনি মনোমধ্যে বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া আবার জর্ম্মনি দেশে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া একটি ভদ্র পরিবারের গৃহে বাসা লইলেন এবং সেই পরিবারের ছেলেদিগকে তিনি ফরাসি শিখাইতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে জর্ম্মণ ভাষায় তাঁহার কথা কহিতে হইত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন এবং এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন যে, একটা দুরূহ উৎকট দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন।

দন্ত-রক্ষা।

ডাক্তার মিলার, কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ দন্তরোগ চিকিৎসক, দন্ত সম্বন্ধে একটা পুস্তক বাহির করিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে, আমাদের পিতামহদের আমলে এইরূপ বিষয় লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করিবার বড় সার্থকতা থাকিত না; সেকালে দন্তরোগ বড় একটা জানা ছিল না। কিন্তু আজকাল সংবাদপত্রে এতপ্রকার 'দন্তচূর্ণে'র বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশেও দন্তের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় এ সম্বন্ধে মিলার সাহেবের বক্তব্য প্রকাশ করিলে নিতান্ত নিষ্ফল না হইবার সম্ভাবনা। ইহাঁর ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা আছে আমরা তাহাই সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি।

আসল কথাটা যাহাতে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় সেই নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব মনুষ্য-দন্তের গঠন সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়াছেন। দন্ত নিম্নলিখিত কয়টি উপাদানে গঠিত—১। এনামেল (enamel); দন্তের যে ভাগ মাড়ির বাহিরে থাকে, ইহা তাহারই উপরিভাগের শ্বেতচিক্কণ আবরণ। ২। এই আবরণের অন্তর্ভাগে ডেণ্টীন (dentine) নামক আসল দন্ত্য পদার্থ। এই ডেণ্টীনের মাঝখানটা ফাঁপা এবং উহার মধ্যের গর্ত্ত হইতে চতুর্দ্দিকে এনামেল পর্য্যন্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রসারিত। ৩। এই গর্ত্তের মধ্যে দন্তের স্নায়ব অংশটুকু (pulp) রক্ষিত। এই অংশ শুধু মধ্যের গর্ত্তে আবদ্ধ নহে; পূর্ব্বোক্ত সরু সরু ছিদ্র দিয়া সমস্ত ডেণ্টীন ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং মাড়ির ভিতর দিয়া শরীরের অন্যান্য স্নায়ুর সহিত ইহার যোগ আছে। ৪। মাড়ির

মধ্যে দন্তের যে অংশ আছে তাহার আচ্ছাদনের নাম সিমেণ্টম (cementum)।

দন্তের কার্য্য সম্বন্ধে ডাক্তার মিলার যাহা বলিয়াছেন তাহা বাহুল্য বিবেচনায়, ডিঙ্গাইয়া একেবারে প্রকৃতপ্রস্তাবে উপনীত হওয়া যাক।

শুধু আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেই দেখা যায় যে যত কাল যাইতেছে দন্তের অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্যশরীরেরও এইরূপ দিন দিন অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং ইহার জন্য সভ্যতাকে দোষ দিয়া থাকেন। মিলার সাহেব বলেন যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে, রোগ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কোন কাজের কথা নহে। এইরূপ মনে হইবার কারণ এই যে পূর্ব্বে যাহারা শারীরিক অপটুতা বশতঃ মোটেই টিঁকিতে পারিত না তাহাদের আজকাল, চিকিৎসা বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হওয়াতে, রুগ্ন অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে। এই জন্যই সভ্যতার প্রভাবে রোগের কারণ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইলেও রোগীসংখ্যা বাড়িতেছে।

কিন্তু দন্ত-রোগ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে হয় যে উহা বাস্তবিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে বাড়িতেছে। য়ুরোপের মধ্যে স্পানিষ পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি যে জাতিসকল সভ্যতা-শৃঙ্খলে ভালরূপ ধরা দেয় নাই তাহাদেরই মধ্যে এখনো অক্ষুণ্ণ দন্তপাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ বা মার্কিন, যাহারা আজকাল সভ্যতাক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাহাদের শত জনের মধ্যে একজনের সমস্ত দন্ত নির্দ্দোষ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—সভ্যতার অবিশ্রাম ঝঞ্ঝটে অনেকগুলি কার্য্য করা হইয়া উঠে না যাহা দন্ত রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

কি কি আবশ্যক তাহা দন্তরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ দুই প্রকারের—১। পিতামাতা হইতে আমরা যাহা কৌলিকসূত্রে লাভ করিয়াছি—২। নিজের দোষে আমরা যাহা ঘটাইয়াছি। প্রথমোক্ত কারণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পিতামাতার শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় দন্ত দুর্ব্বল বা অসম্পূর্ণ হয়। ইহার অবশ্য কোন প্রতিকার নাই, তবে বিশেষ সাবধানে নিয়ম পালন করিলে বিপদ-সম্ভাবনা কিছু কম। কথন কথন এমনও হয় যে চোয়াল ছোট হওয়ার দরুণ দন্তগুলি যথেষ্ট স্থান পায় না এবং ঠেসাঠেসিতে পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপ পরিণতি লাভ করিতে দেয় না। এ অবস্থায় কোন উপযুক্ত দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা যে কোন একটা দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ফাঁক ক্রমে আপনা হইতেই বুজিয়া আসে এবং বাকি দন্তগুলি যথেষ্ট স্থান পাইয়া আবশ্যকমত বাড়িতে পারে।

নিজের দোষে অনেক প্রকারে রোগ জন্মিতে পারে। একটা প্রধান কারণ রীতিমত পরিষ্কার না করা। মিলার সাহেবের মতে দন্ত মাজিলেই যে সব সময়ে রীতিমত পরিষ্কার করা হইল তাহা নহে। মুখের মধ্যে কোনরূপ খাদ্যাবশেষের লেশমাত্র উপস্থিত থাকিলে তাহা ক্রমে এক প্রকার জীবাণুর বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। এই জীবাণুগুলি একবার এনামেল নষ্ট করিয়া ফেলিলে দন্তের স্নায়ব অংশ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে বাতাস লাগিলে অতি তীব্র বেদনা অনুভব হয়। একবার এইরূপ অবস্থা হইলে আর সে দন্তকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার কোন উপায় নাই। তবে আজকাল এইরূপ ভগ্ন-দন্তকে কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া সকল প্রকার কার্য্য চালান যাইতে পারে।

কিন্তু পরিষ্কার করিবার প্রকৃত উপায় কি? প্রথমতঃ দন্তের ফাঁকে কোনরূপ বাজে পদার্থ না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গুলিদ্বারা দন্তমার্জ্জন অপেক্ষা দাঁতন করা বা বিলাতী তৈয়ারী বুরুষ * ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে অঙ্গুলি কেবল দন্তের উপরিভাগ দেখিতে পরিষ্কার রাখে, কিন্তু দন্তের ফাঁকে ফাঁকে,যেখানে অপরিষ্কার থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে দাঁতন-কাষ্ঠ বা বুরুষের ন্যায় অঙ্গুলির প্রবেশ সম্ভবে না। তাহার পর সহজ উপায়ে যাহা তাড়ান না যায় তাহার নিমিত্ত মিলার সাহেব এক ঔষধ † ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এই ঔষধ এক মিনিটকাল মুখে রাখিয়া ফেলিয়া দিলে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাতে কোনপ্রকার জীবাণু জন্মাইবার সম্ভাবনা একেবারেই দূরীভূত হইল। অজীর্ণ রোগ-জনিত লালায় যে অম্লরসের সঞ্চার হয় তাহা এই জীবাণু বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে এবং কঠিন এনামেলকে কিয়ৎপরিমাণে নরম করিয়া আনিয়া জীবাণুদের আক্রমণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। অতএব আজকাল আপিস ইস্কুল প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার জন্য খাবার সময়ে যেরূপ তাড়াহুড় পড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য, প্রকাশ্যভাবেই হোক বা অম্লরস আকারেই

---

* মিলার সাহেবের মতে Dr Pierreponte's perfect cleansing brushes সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

† R. Thymol ... ... 1 gr.
Acid Benzoic ... ... 12 grs.
Tinct. Eucalypt. ... 1 dr.
Eau-de-Cologne ... 1 oz.
Oil of Peppermint ... 10 m.
Water add to ... ... 6 oz. Mix.
One teaspoonful in a wineglass of water.

হোক, যে অজীর্ণতা উপস্থিত হয়, তাহারই প্রভাবে বোধ করি এই নূতন রোগ আমাদের দেশ অল্প অল্প করিয়া অধিকার করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই জীবাণু-বিশিষ্ট লালা বড়ই বিষাক্ত। কুক্কুর বিড়াল প্রভৃতি কোন ক্ষুদ্র জন্তর রক্তের মধ্যে এই লালার কিয়দংশ প্রবেশ করাইয়া দিলে সে অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া যায়। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে এই লালা খাদ্যের সহিত মনুষ্যশরীরে প্রবেশ লাভ করিলে নানা প্রকার ঔদরিক গোলযোগ ঘটা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এমনও দুই একবার দেখা গিয়াছে যে, কোন গতিকে ইহা রক্তে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যেরও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

মিলার সাহেবের গ্রন্থ হইতে এই দেখা যাইতেছে যে সাবধানে থাকাই প্রধান উপায়। একবার কোন গতিকে এনামেল নষ্ট হইলে স্বাভাবিক দন্ত আর ফিরিয়া পাইবার যো নাই। তবে সভ্যতার প্রভাবে যেমন স্বাভাবিক দন্ত নষ্ট হইতেছে তেমনি কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত করিবার নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে। এখন একটি দন্ত ক্ষয় হইয়া গেলে তাহার মধ্যস্থিত স্নায়ব চেতন অংশটুকু বাহির করিয়া দন্তকে সম্পূর্ণ জড় করিয়া ফেলিয়া স্বর্ণ বা অন্য প্রকার ধাতুর দ্বারা সেই গর্ত্ত পুরাইয়া দিলে দেখিতেও কোন প্রভেদ পাওয়া যায় না কার্য্যও বেশ চলিয়া যায়। এবং সভ্যতার যখন দোষ দেওয়া হইয়াছে তখন এইটুকু প্রশংসাও করা উচিত যে, পূর্ব্বে যেরূপ, বৃদ্ধদের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দন্ত পড়িয়া গেলে, কোন উপায় থাকিত না এখন তাঁহাদের তেমন নিরাশ্বাস হইবার কোন কারণ নাই। কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই পূর্ব্বের দন্ত অপেক্ষা সুগঠিত দুইটি দন্তপাটি যে কেহ অনায়াসে পাইতে পারে।

বাল্যবিবাহ।

সম্প্রতি ডাক্তার ষ্ট্র্যাহান সাহেব "বিবাহ ও ব্যাধি" নামক গ্রন্থে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

ডাক্তার বলিতেছেন, নাবালক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে, সেই চুক্তি জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া সপ্রমাণিত না হইলে আদালত তাহা কোনমতে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু বিবাহ এমন যে গুরুতর চুক্তি, নাবালক কর্ত্তৃক সেই চুক্তি সম্পন্ন হইলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর অন্য উপায় নাই। ইহা কি নিদারুণ বিধি নহে!

পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা অনেক সময়ে পাত্র নির্ব্বাচন করেন সত্য বটে, কিন্তু ইহাঁরা সকল সময়েই যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তাহা স্বীকার করা যায় না। যেখানে আমৃত্যু দৃঢ় বন্ধনে থাকিতে হইবে সেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবনের সঙ্গী খুঁজিয়া না লইলে নানা অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইবার খুবই সম্ভাবনা।

যাঁহারা বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, বাল্যবিবাহে বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া সমাজ সতেজ এবং উন্নত হয়। ডাক্তার লিখিতেছেন, বাল্যবিবাহে অত্যাশ্চর্য্য বংশবৃদ্ধি হয় সে কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে সমাজের কতদূর শোভাবর্দ্ধন হয় সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ রাশি রাশি যে সকল খর্ব্বাকৃতি, বালবৃদ্ধ জীর্ণ মানবসন্তান জন্মগ্রহণ

করে, তাহারা হয় শৈশবেই মানবলীলা সম্বরণ করে, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে যদি টি'কিয়া যায় ত জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাকেই যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বল, সে স্বতন্ত্র কথা।

বাল্যবিবাহে সমাজে দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতার প্রতিরোধ হয়, এইরূপ মতও আজকাল শুনা যায়। কিন্তু এই দুর্নীতি কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ পাপমূর্ত্তিতে বিরাজ করে! অপ্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত মানবসমাজে, না বাল্যবিবাহপ্রসূত অশিক্ষিত হতভাগ্য মানব-কীটের মধ্যে! বাল্যবিবাহ করিয়া অসংযত বংশবৃদ্ধিপূর্ব্বক সমাজকে ব্যাধি-নিলয় করিয়া তোলা কি দুর্নীতি নহে!

ইহার পরে ডাক্তার মহাশয় বাল্যবিবাহে জীবনীশক্তির কিরূপে হ্রাস হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, পিতামাতার জীবনীশক্তি সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। এই জীবনীশক্তি রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য দুরাচার প্রভৃতি নানা কারণে হ্রাস হইয়া আসে, অথবা স্বতঃই ইহা ক্ষীণভাবাপন্ন থাকে—যেমন অপূর্ণ বাল্যাবস্থায়। অতএব, বাল্যবিবাহে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মলাভ করে, জীবনীশক্তির অল্পতাপ্রযুক্ত তাহারা চির-রুগ্ন এবং জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়।

নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায়, অপূর্ণ অপরিপুষ্ট অবস্থায় যে সকল শাবক উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায়ই হ্রস্বাকার, নিস্তেজ এবং বিকলাঙ্গ হয়, এইনিমিত্ত যাহারা যৌন-সম্বন্ধে অশ্ব গো প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে, তাহারা উক্ত জন্তুরা যতদিন না পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহাদের মধ্যে

মিলন সঙ্ঘটন করায় না। ডাক্তার নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন একটি শূকর অপূর্ণাবস্থায় যে সকল শাবক প্রসব করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই জন্মিবার পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে মারা পড়িল। কিন্তু ঐ শূকর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া আবার যখন প্রসব করিল তখন শাবকেরা বেশ সুস্থ, সবল এবং দেখিতে সুশ্রী হইল। গৃহপালিত কুকুরের সর্ব্বপ্রথম শাবকেরা জীবন্মৃত হইয়া কোন কাজে আসে না বলিয়া অনেক সময়ে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত অপেক্ষা অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতামাতার সন্তানসন্ততি যে অনেকাংশে হীন হয়, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আরিষ্টটল্ বলেন, গ্রীসের কোন কোন বিভাগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত হ্রস্বকায় ছিল। ফ্রান্সে এক সময়ে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার ভয়ে অনেকে যখন বাল্যবিবাহ করিল, তখন কীটের ন্যায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানসন্ততিরা সাঙ্ঘাতিক রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৮১২-১৩ খৃষ্টাব্দেও ফ্রান্সে বাল্যবিবাহের শোচনীয় ফল ফলিয়াছিল।

বাল্যবিবাহপ্রসূত সন্তানসন্ততিরাই যে কেবল অন্ধ, খঞ্জ, উন্মাদ এবং উৎকট রোগাক্রান্ত হয় তাহা নহে, প্রসূতি মাতারও সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তার ম্যাথিউস্ ডন্‌কান্ বলেন, গর্ভনষ্ট, যমক ও মৃতসন্তানপ্রসব প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের যে সকল বিপদ আছে, বাল্যবিবাহই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাল্যবিবাহ যদি সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কত যে শিশু-জননী অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহা বলা যায় না।

অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তানসন্ততিরা প্রায়ই দুঃসাহসিক হয় না, বিজ্ঞ ম্যারো ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে হত্যাকারী অপেক্ষা চোর প্রতারকের সংখ্যা এত অধিক। জোসেফ করসিও অনেক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে কলকারখানার মজুরদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত। বার চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকবালিকা যাহাদের একবেলা অন্ন জুটে না, অজ্ঞানতাবশতঃ তাহারা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অল্পকালের মধ্যে বহু সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিয়া জীবনকে অসহ্য করিয়া তোলে। বদ্ধবায়ুসেবন, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতিও যে এই রুগ্নসন্তান উৎপাদনের অন্যতম কারণ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে রেজিষ্ট্রার জেনেরাল সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিবাহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, ষ্ট্রাহান সাহেব তাহা হইতে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুরুষদিগের মধ্যে ৩৫৭৬ জন উনিশ বৎসর বয়সে, ৭২৮ জন আঠার বৎসর বয়সে, ৫৯ জন সতের বৎসর বয়সে এবং ৩ জন ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১৪৭২ জন সতের বৎসর বয়সে, ১৬৭ জন ষোল বৎসর বয়সে এবং ২০ জন পনের বৎসর বয়সে বিবাহ করে। ইহারা অধিকাংশই কলকারখানার মজুর। এই সকল বিবাহের ফল কল্পনা করিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পরিশেষে ডাক্তার বলিতেছেন, ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন যখন ষোল বৎসর অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা বালিকা অযথা সংসর্গে সম্মতি প্রদান করিতে অনুপযুক্তা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে, তখন ঐ

বালিকা বিবাহে সম্মতি দান করিতে উপযুক্ত বলিয়া কিসে স্থির হইল! স্ত্রীজাতি আঠার বৎসর বয়সের নীচে এবং পুরুষজাতি কুড়ি বৎসর বয়সের নীচে বিবাহ না করিতে পারে এইরূপ আইন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা।

অলঙ্কারের নির্দ্দেশানুসারে মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইলেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সহিত কালিদাসের রঘুবংশের একটা বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ অনেকগুলি রাজা—কেহ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তপোবনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, কেহ দিগ্বিজয়ী ধনুর্দ্ধর, কেহ প্রিয়বিরহে বিলাপ করিয়া সারা, কেহ পিতৃসত্যপালনার্থে বনে বনে ফিরেন, কেহ বা প্রমদাজনবেষ্টিত হইয়া অহর্নিশি সুরাপানে কালক্ষয় করেন—প্রত্যেকের জীবনের মূল ঘটনা স্বতন্ত্র এবং কালভেদে একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ঘটনার বড় সম্পর্ক নাই। যোগ এই পর্য্যন্ত যে, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং এইরূপে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশাবলী।

রামায়ণ মহাভারত এরূপ কুলজী নহে। কুলের কথা তাহাতে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে মাত্র।

সমগ্র কাব্যখানি সেই সূত্রে গ্রথিত বলা যায় না। কবির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের যে চরম আদর্শ জাগিয়া ছিল সেই আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া তিনি রামকে গড়িয়াছেন। এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলিও রামেরই আনুষঙ্গিক।

মহাভারতে ঘটনারও যেমন অন্ত নাই, লোকেরও অন্ত নাই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শত ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বিস্তর বড়লোক এবং প্রত্যেকেরই নিজত্ব বিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু এই বিবিধ ছোট বড় ঘটনা এবং বিচিত্র প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমাবেশ কুরুক্ষেত্রব্যাপারেরই সূচনা। প্রতি ঘটনা এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বায়োজন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রলয়ের রঙ্গভূমিতে অভিনেতা।

রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বতকুলের বর্ণনা। কোন মূল ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজচরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিম্বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে এক প্রাচীন বংশাবলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন?

ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্গপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার

অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেই-রূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এই-গুলি ছবি, বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনামাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্য নৃপতিদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল ছবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান।

এবং কালিদাস ক্রমাগতই চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়াছেন। অনেক স্থলে একই পথবর্ণনার এক-একটি শ্লোকে এক-একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পথ কখনও গ্রামের প্রান্ত দিয়া কখনও বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষ এক স্যন্দনে বসিয়া রাজা ও রাণী এই পথে গুরুগৃহে চলিয়াছেন। পথের দুইধারে কোথাও স্যন্দনবদ্ধদৃষ্টি হরিণমিথুন, কোথাও রথনেমিস্বনোন্মুখ ময়ূরদল, গ্রামপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে ঘৃতভাণ্ডহস্তে ঘোষবৃদ্ধেরা রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়—রাজা তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, রাজদর্শনে প্রীত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরে।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে রাজা দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরিবিলি তপোবন—কালিদাসের কল্পনার প্রিয় বিহারভূমি। উজ্জয়িনীর

নাগরিকতা হইতে তিনি যেন এইখানে আপন মানসী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রামলাভ করেন। কিন্তু এ তপোবনে তপস্যার কঠোরতা বড় নাই—কেবলি একটি পবিত্র হোমধূমাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহাশ্রম। এখানে ঋষিপত্নীরা ব্রত আচরণ করেন, বিকালবেলায় উটজদ্বারে দাঁড়াইয়া অপত্যবৎ হরিণযুথকে নীবার রোমন্থন করিতে দেখেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটহস্তে আলবালে জলসেক করিয়া থাকেন এবং সেকান্তে আলবালাম্বুপায়ী বিহঙ্গগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এখানে কেবলি স্নেহ দয়া মায়া, রমণীর শুভ্র কোমলতা—দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সিংহাসন এবং চক্রান্ত নাই—শুধু শান্তি এবং সন্তোষ। কালিদাস ইহাই উপভোগ করেন—সরল হৃদয় এবং পবিত্র প্রীতিভাব, বিকশিত সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং সুডোল নিটোল গঠন, নিরলঙ্কার রমণীয়তা এবং বল্কলবদ্ধ বিমল যৌবন।

রাজদম্পতি এই তপোবনে পর্ণশালায় থাকিয়া ধেনুর সেবা করেন। প্রত্যহ প্রভাতে নন্দিনীকে লইয়া বনে বাহির হন এবং সায়ংকালে ঝিল্লিমুখরিত বনপথ দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসেন। একদিন সহসা দেখিলেন, নন্দিনী নিকটে নাই—অদূরে শৈলগহ্বরের সম্মুখে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—নন্দিনী কাতরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাহিয়া। রাজা ধনুতে শরযোজনা করিলেন—কিন্তু নন্দিনীর মায়াপ্রভাবে তাঁহার হস্ত অসাড়—ধনুর্ব্বাণহস্তে যেমনটি তেমনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাসও চিত্রিতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কেবল একটি সুন্দর চিত্রহিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য।

অবশেষে নন্দিনী প্রীত হইয়া রাজাকে অভিলষিত বরপ্রদান করিল। গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাদি করিয়া সস্ত্রীক দিলীপ

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনমধ্যেই সুদক্ষিণার দোহদলক্ষণ দেখা দিল।

সুদক্ষিণা যখন অন্তঃসত্ত্বা কালিদাস দিলীপের অন্তঃপুরে গিয়া একএকবার মহিষীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং গর্ভিণীর পাণ্ডু মুখশ্রী, মন্থরগতি, আলসভাব—পরিপূর্ণা দোহদশ্রী—এক আধটি মৃদু উপমার চিত্রিত করিয়াছেন; কোথাও উষাকালীন ক্ষীণ পাণ্ডু শশীর সাদৃশ্যে; কোথাও বা পুরাতন পত্রাপগমে সমুদ্ভ-মনোজ্ঞপল্লবা লতিকার সহিত তুলনায়।

শুধু ইহাই নহে, দু'একটি নিভৃত সুন্দর দাম্পত্যচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানসম্ভাবনায় মহিষীর আদর বাড়িয়াছে—রাজা যখন তখন অন্তঃপুরে আসিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি পরিতে সাধ যায় ইত্যাদি। এবং ঘন ঘন সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আনন আঘ্রাণ করিয়া দিলীপের আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না।

এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু'একস্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়; এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দ্দিকের বনবাসবৃত্তান্তালেখ্যদর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিলীপ রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল। উজ্জ্বল দিন। দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ইক্ষুচ্ছায়ার বসিয়া কৃষকাঙ্গনারা গ্রাম্য কবিরচিত রঘুকর্ত্তৃক ইন্দ্রবিজয় গাথা গাহিতেছে। রাজধানী সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শুভদিনে

শুভক্ষণে রঘু সেনাদল সহ যাত্রা করিলেন। পৌরাঙ্গনারা চতুর্দ্দিক হইতে লাজরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুরঙ্গ সেনা যেখান দিয়া যায় ধূলায় আকাশ ছাইয়া ফেলে। মাতঙ্গকুল শুণ্ডের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে থাকে—বন উজাড় হইয়া যায়। জয়োল্লাসমত্ত রঘুসেনা কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বুলপত্রপুটে নারিকেলসুরাপানে কালহরণ করে। কোথাও নৌসেতু বাঁধিয়া, কোথাও বা হস্তীপৃষ্ঠে রঘু সসৈন্যে নদী পার হয়েন।

তাহার পর স্বয়ম্বরসভা। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় ভারতের যত সম্ভ্রান্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রত্যেকের এক একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই রাজগণবর্ণনায় মধ্যে দু'একটি মৃদুস্পর্শ টান দিয়া রূপসীর রূপের আভাসে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহারিণী সুনন্দা মগধঈশ্বরের বর্ণনা করিতেছে—মগধরাজ বহু যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন এবং সেই অবধি বিরহিণী শচীর কেশবিন্যাস বন্ধ। দেবাঙ্গনাবাঞ্ছিত অঙ্গদেশাধিপতির বর্ণনা—অঙ্গরাজ যখন শত্রুদিগকে বধ করিলেন, তাহাদের রমণীরা মুক্তাহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিল এবং মুক্তাফলস্থূল অশ্রুবিন্দু তাহাদের স্তনদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ব্বিষহতেজ মথুরাধিপ সুষেণ স্নিগ্ধকান্তি এবং নয়নাভিরাম—জলক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তনচন্দনপ্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্ম্মিসংসক্ত হইয়া শোভা পায়। ইন্দুমতী একে একে নমস্কারপূর্ব্বক সকলকেই সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রমে অজের নাম; সুনন্দা বলিতে লাগিল—ইঁহারি পিতামহ দিলীপ যাঁহার শাসনে পথিমধ্যে নিদ্রিতা নর্ত্তকীর অঙ্গ-

বসন উড়াইতে বায়ুও সাহস করিত না, পিতা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে মৃণ্ময়পাত্রমাত্র রাখিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, এবং কুলে শীলে রূপে গুণে ও নবীন যৌবনে ইনি তোমার তুল্য বর, ইহাঁকে বরণ কর, রতনে কাঞ্চনে মিলন হউক্। অজের গলদেশে বরমাল্য শোভা পাইল।

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য—রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন তখন কোথায় অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, না, কালিদাস স্ত্রী এবং বসন্ত এবং ললিত আদিরসে মৃগয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্তকাল, গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে কোকিলকূজন, ফুলে ফুলে ভ্রমরগুঞ্জন, মৃদু মলয়ানিল, এবং মদনশরজর্জ্জর বিলাসবিভ্রম, পতির সহিত অঙ্গনাগণের বকুলমদ্যপান, ঢলাঢলি গলাগলি। রূপসী নহিলে মৃগয়া হয় না—অধরসুধার উত্তেজনা চাহি, নূপুরনিক্বণের উদ্দীপনা চাহি, মদনশরের পরিচালনা চাহি।

রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনা হইতে কালিদাসের মৃগয়াচিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামায়ণে এসকল ললিত বর্ণনা কোথাও নাই। দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি যুবরাজ এবং অবিবাহিত। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার নিকট দশরথ এই মৃগয়াবৃত্তান্ত বলিতেছেন—

"হে দেবি! যে সময়ে আমি যুবরাজ ছিলাম এবং তোমারও বিবাহ হয় নাই, সেই সময়ে একদা আমার ঔৎসুক্যবর্দ্ধক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য স্বীয় কিরণ-দ্বারা জগৎ উপতাপিত এবং পার্থিব রস সমস্ত শোষিত করিয়া প্রেতগণ-

সেবিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলে সদ্যই গ্রীষ্ম অন্তর্হিত হইল এবং স্নিগ্ধ মেঘ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আনন্দিত হইল; বিহগ সকল বৃষ্টিজলে স্নাত ও ক্লিন্নপক্ষোত্তর হইয়া অতিকষ্টে, বৃষ্টি ও বায়ুবেগে যাহাদিগের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে, তাদৃশ বৃক্ষ সমুদায় আশ্রয় করিতে লাগিল; মত্ত চাতকগণে সেবিত পর্ব্বত পতিত ও পতনোদ্যত জলে আচ্ছাদিত হইয়া তোয়রাশির ন্যায় প্রকাশমান হইল; এবং স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুসংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায়, বক্রভাবে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতি-সুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত ব্যায়ামাভিপ্রায়ে জল-পানার্থে তীরে সমাগত গজ, মহিষ, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু হননে অভিলাষী হইয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সরযূ নদীতে গমন করি-লাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় অদৃশ্যস্থানে জলমধ্যে গর্জ্জনকারী বারণের শব্দতুল্য কোন ব্যক্তির কুম্ভপূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। পরে গজ-হননেচ্ছু হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক আশীবিষতুল্য প্রদীপ্ত শর গ্রহণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।"

রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন ফেসান মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণে এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্ব্বসূচনা করিয়া-ছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভীষণতা ব্যক্ত হয়। কালি-দাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।

ভবভূতি হইলে মুনিপুত্রবধ লইয়া এইখানে অনেক করুণরস উদ্রেক করিতেন। বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া তিনি ঘন বর্ষার একটি গম্ভীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে ধনুর্ব্বাণহস্ত দশরথের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। এবং বাণবিদ্ধ ঋষিবালকের করুণ বিলাপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিত।

কালিদাস করুণরসে এমন পটু নহেন। দশরথের মৃগয়ায় মুনিপুত্রবধ ব্যাপারকে তিনি বড় প্রাধান্যই দেন নাই। যেখানে বা তাঁহার করুণারস উদ্বেলিত হইয়া উঠে সেখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য চিত্রবিন্যস্ত। শোকের মধ্যেও তিনি রূপ এবং যৌবন, বিলাস এবং বিভ্রম চিত্রিত করেন, এবং এই রূপযৌবনবিভ্রমবিলাসের স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ বিলাপ রচিত হয়। প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন; নূপুরনিক্বণসহিত অশোক তরুতে মৃদু পাদতাড়ন; কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী; ললিত কলাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা; কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যে শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস;—শ্লোকের পর শ্লোক কেবলি চিত্রবিন্যাস।

সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র। রাম যখন সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন ঘটনা কিছুই নাই—কেবল আকাশপথে একখানি রথ চলিয়াছে এবং সেই রথে বসিয়া অযোধ্যার রাজদম্পতি। কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং সমুদ্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতে দৃশ্য বিচিত্র। সুতরাং চিত্ররচনার এই অবসর। প্রথমেই সমুদ্রবর্ণনা—কতকগুলি চিত্র—কোথাও সেতুবন্ধে ফেনিল অম্বুরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে, কোথাও আকাশে সাগরে মিশাইয়া গিয়া এক অনন্ত বিস্তার, কোথাও তমালতালীবনরাজিনীলা দূর বেলাভূমি, কোথাও বা গুটিকতক পৌরাণিক স্মৃতি—বিস্মৃত সগরকাহিনী, পুরাতন মন্থনকথা—এবং

ইহারই মধ্যে যেথানে অবসর ঘটিয়াছে সুবিধামত একটু আধটু অধরপানের প্রসঙ্গ। ক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রথ জনস্থানের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইতেছেন;—এই সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যেথানে আসিয়া তোমার চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখে বদ্ধমৌন একটি নূপুর কুড়াইয়া পাই; এই পর্ব্বতশৃঙ্গে একদিন—মনে পড়ে কি?—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে পতির গাঢ় আলিঙ্গনমধ্যে মুদিতনয়নে আপনাকে লুকাইয়াছিলে; আর ঐ অম্বরলেখি গিরিশৃঙ্গে একদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, কেকাধ্বনিতে, কদম্বসৌরভে চারিদিক আকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার বিরহে সেদিন আমার জীবন অসহ্য বোধ হইয়াছিল; এই পম্পাসরোবরে—অহো!—তুমি তখন নিকটে ছিলে না, আমি নির্নিমেষনেত্রে শুধু ঐ চক্রবাকমিথুনের নীরব প্রেমালাপ দেখিতাম; সাশ্রুনয়নে এইখানে একদিন স্তবকাভিনম্র অশোকলতাকে দেখিয়া পীনপয়োধরা জনকতনয়া ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই—ভাগ্যে লক্ষ্মণ ছিল, সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল; দূরে ঐ পঞ্চাপ্সর বিহারবারি—সমাধিভীত ইন্দ্র একজন তপস্বীকে এইখানে অপ্সরাগণের যৌবনকূটবন্ধে আবদ্ধ করেন; আর এই সেই সুতীক্ষ্ণাশ্রম—সুতীক্ষ্ণের নিকট সুরাঙ্গনাদিগের বিভ্রমচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, সহাসপ্রেক্ষিতদৃষ্টি এবং ব্যাজার্দ্ধসংদর্শিতমেখলা উভয়ই সফল হয় নাই; ঐ সরযূ দেখা যায়—তরঙ্গহস্তদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন জানাইতেছে। রথ আসিয়া থামিল। রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এতদিনে অযোধ্যার শ্রী ফিরিল। প্রাসাদসকল হইতে কালাগুরুধূম নির্গত হইতেছে—যেন রামচন্দ্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া

আসিয়া স্বহস্তে পুরীর বেণী মোচন করিয়া দিয়াছেন। রাজা একদিন প্রাসাদশিখরে উঠিয়া অযোধ্যাপুরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিলাসী বিলাসিনীরা প্রমোদ-উদ্যানে বিহার করিতেছে এবং সরযূ পণ্যবাহিনী তরণীপরিপূর্ণ।

অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে এই বিলাস পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত। রাজা বিলাসিনীপরিবৃত হইয়া অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরেই থাকেন; প্রজারা তাঁহার দর্শন পায় না; রাজকার্য্য মন্ত্রীবর্গ সুসম্পন্ন করেন। অন্তঃপুরে নিত্য মন্মথোৎসব। রাজা কামিনীগণের সহিত জলবিহার করেন—জলে বিলাসিনীদিগের নয়নাঞ্জন ও অধরের কৃত্রিম রাগ ধুইয়া যায় এবং স্বাভাবিক মুখরাগ অগ্নিবর্ণকে অধিকতর প্রলোভিত করে। বিলাসিনীদিগের সহিত মনোরম পানভূমিতে বসিয়া তিনি বকুলের সুরা পান করিতে থাকেন এবং প্রমদাগণপ্রদত্ত মুখাসবপানে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। রাজার এক অঙ্কে বীণা, অপর অঙ্কে অঙ্গনা, এবং সম্মুখে অবিশ্রাম নর্ত্তকীর লাস্যলীলা। প্রমদা হইতে প্রমদান্তরে, বিলাস হইতে বিলাসান্তরে অগ্নিবর্ণ নিত্য রমণ করেন। বিপুল অন্তঃপুরেও কুলাইয়া উঠে না। লতাকুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া পরিজনাঙ্গনাগণের সহিত প্রমোদালাপে কালক্ষেপ করিতে যান। বাদ্‌শাহী বিলাসিতাও এখানে হার মানে। এবং এই উৎকট উন্মাদনা রাজযক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হইয়া অল্পদিনমধ্যেই অগ্নিবর্ণকে ইহলোকের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লয়।

এইখানেই রঘুবংশের উপসংহার—এই বাদ্‌শাহী বিলাসের এক-সর্গ চিত্রপরম্পরায়। সুতরাং রঘুবংশ সম্বন্ধে আমাদের আর জানিবার বড় কিছু রহিল না। এবং এই উনবিংশ সর্গের মহাকাব্য হইতেই বোধ করি কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। কালিদাসের অন্য কাব্য আলোচনা করিলেও তাঁহার এই বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘদূতের মত অমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনের মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যক্ষের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য মাত্র।—

মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘ পথ বর্ষা, বিরহ এবং অভিসারের মায়ারচনা। প্রতি বিরহিণীর দুঃখবর্ণনায় যক্ষ আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুরমূর্ত্তি আঁকিয়া বাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদবিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।

এইরূপ চিত্র আঁকিতেই কালিদাস কিছু ভালবাসেন। বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে লঘুগতি অভিসারিকা; মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একবেণী বিরহিণী—উৎসঙ্গে বীণা পড়িয়া রহিয়াছে, মুখের গান মুখেই রহিয়া গিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে শুধু মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রাবণ ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রবাসী রামগিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মেঘের পানে চাহিয়া—মেঘ যদি দৌত্যকার্য্য করে!

কুমারসম্ভবও কতকগুলি ছবি। প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়তঃ শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়তঃ গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধ শিব। চতুর্থতঃ শিবের বিবাহ।

রতিবিলাপেও করুণরসে কালিদাসের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠে নাই—তাহা নৈপুণ্যপরিপূর্ণ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমেই কালিদাস রতিকে এক কথায় আঁকিয়া তুলিলেন—রতি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী। রতির আর বাঁচিবার সাধ নাই—স্বামীর অনুগমন ভিন্ন তাহার জ্বালা জুড়াইবে না। সেই রতি বিলাপ করিতেছেন,

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
  পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াঃ
  ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥
নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্
  বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
  প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥ ইত্যাদি।

পরে পরে কতকগুলি ছবি—ঘন-অন্ধকার রাজপথে ঘনগর্জ্জন-ভীতা একাকিনী অভিসারিকা, বারুণীমদ্যপানে অরুণনয়না স্খলিত-বচনা প্রমদাজন, তাহার পর জ্যোৎস্না কোকিল মলয় যে যে-খানে আছে, এবং মদনাভাবে এই সকলের নিষ্ফলতা;—অতএব, হে মদন, তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের গতি কর।

এ পর্য্যন্ত কালিদাসের প্রতিভার যে বিশেষত্ব দেখা গেল শকুন্তলায় ইহার পূর্ণবিকাশ। বহিঃপ্রকৃতিতে চিত্রকরের মানসী প্রতিমা এইখানে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য চিত্রগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ।

প্রথমেই রথযাত্রা। রাজা দুষ্মন্ত রথারোহণে দ্রুতগামী কৃষ্ণ-সারের অনুসরণ করিয়াছেন, মৃগ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মনোহর গ্রীবাভঙ্গ সহকারে মুহুর্মুহু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। রথের গতিবেগ এত দ্রুত যে,

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্‌ বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥

ইহা নাট্যকলার বিরোধী। কারণ, অতিক্রত রথযাত্রা এবং তদবস্থায় রাজা ও সারথীর কথোপকথন দৃশ্যকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কেমন ছবি!

তাহার পর তপোবনবর্ণনা। ক্রমে, আলবালে ঋষিকন্যাদের জলসেচন এবং রাজার গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ; শকুন্তলার নিবিষ্টচিত্তে রাজার ধ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ; শকুন্তলার বিদায়; রাজসভার দৃশ্য; অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্ত রাজার উৎকণ্ঠা ও দূরে মহিষীর গান; সিংহশিশুর সহিত বালকের খেলা ও শিশুচিত্র।

এইগুলি এক একখানি ছবি নহে—ইহারই এক একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি খুঁটিনাটি ঘটনা এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গীতে যতরকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবকশাখায় বল্কল আটকিয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর কচি কিসলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্য্যের কবি সৌন্দর্য্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গী, একটি হৃদ্‌স্পন্দন, পাণ্ডু মুখ-

কমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমাসঞ্চার এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। যেখানে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—যেমন স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া—সেখানেও কেবল একটি সুন্দর চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যদিও নাটক এবং উহার মধ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব থাকিতে পারে তথাপি শকুন্তলা আমাদের মনে প্রধানতঃ কতকগুলি চিত্রশ্রেণী টাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমরা যে শকুন্তলার ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাই তাহা নহে, বরঞ্চ উহার স্থির মুহূর্ত্তগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখে—নাটকটি অগ্রসর হইতে হইতে যে যে স্থানে ছবি-আকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সেই স্থানই আমাদের চোখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।

যেমন, বিদায়দৃশ্য। শকুন্তলা অগ্রসর হইতে যান, পশ্চাৎ হইতে কে যেন টানিয়া রাখে, ফিরিয়া দেখেন তাঁহারই স্নেহপালিত মৃগশিশু অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। প্রত্যেক তরু এবং লতা শকুন্তলার সুখদুঃখের সঙ্গী—বারবার তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

রাজসভামধ্যে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও ঘটনা অধিক নয় এবং শকুন্তলা কথাও বড় বলেন নাই, কেবল সেই সভামধ্যে দুষ্মন্তকে 'পৌরব' সম্ভাষণ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখনই দুষ্মন্ত, রাজসভা, শার্ঙ্গরব শারদ্বত এবং এই দুই তপস্বীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী তপোবনবালিকার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

কেবলমাত্র "অয়মহং ভোঃ" এইটুকুতে শকুন্তলার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা এই বলিয়া আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবু শকুন্তলা মাথা তুলিলেন না, তাঁহার মুখে কথা নাই।

এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্ত্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষি-বালিকার সমাবেশ করিয়াছেন সেখানে এই তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর, একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্যব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন। আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করিতে পারেন কালিদাস এমন একটি বিষয় সৃজন করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেবল চিত্ররচনা নহে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনাতেই কালিদাসের প্রতিভার বিশেষ পটুত্ব। পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ পথের দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষ্বাকুবংশের একটা দীর্ঘ

প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুইপার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ। প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণ-চাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্যও মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুইপার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনো পাখী, কখনো মেঘ, কখনো লতা, কখনো পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটা-কেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জ্বলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা চিত্রিতব্য বিষয়

নহে—কারণ বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতি নৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্রসমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।

বুদ্ধচরিত।

যদি বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত এবং বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের ন্যায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিত তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে সেই প্রকাণ্ড ধর্ম্মের নামগন্ধ পর্য্যন্ত থাকিত না এবং বৌদ্ধেরা যে কি প্রকার জীব ছিল তাহার পরিচয় আমরা কোন স্থানে বা কোন পুস্তকে পাইতাম না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাক্যের ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম হইয়া অবতীর্ণ হয়। ইহার জন্ম ভারতে হয় বটে; কিন্তু ইহা জাতিনির্ব্বিশেষে সকল লোককে পরিত্রাণ দিবার জন্য সৃষ্ট হয়। সেই জন্য ভারত হইতে বহির্ভূত হইলেও আজ সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব আমরা নানা দিক হইতে পাইতেছি। শুদ্ধ এদেশে প্রচারিত হইলে আমরা এধর্ম্ম যে কোনকালে জীবিত ছিল, তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু শাক্য বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই তাঁহার ধর্ম্ম ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং অশো-

কের রাজত্বকালে তাহা এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাখণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেও আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদয় বৃত্তান্তই অন্য দেশ হইতে প্রাপ্ত হই।

এই ধর্ম্ম যে কিপ্রকারে এদেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহার বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা যায় বটে, কিন্তু সে বৃত্তান্ত ঘোর অন্ধকারে আবৃত। হিন্দুরা সে ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র রাখে নাই। তবে ইতিহাস এবং সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা দুই একটা স্থূল কারণ অনুমান করিয়া লইতে পারি। প্রথমতঃ কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল এবং কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছিল। হিন্দুদিগের যত তন্ত্রমন্ত্রের বিষয় আমরা পাঠ করি সে সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্মকেও গ্রাস করিয়াছিল। অবশেষে এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের কুসংস্কার এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইত না। সুতরাং সেই পূর্ব্বকার তেজ বল ও বিশ্বাস বৌদ্ধদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায়। এদিকে হিন্দুদিগের পৌরাণিক ভক্তি এবং একেশ্বরতত্ত্ব দিন দিন গাঢ় এবং বলবান্ হইতে লাগিল। শাক্যের ধর্ম্ম এক হিসাবে নিরীশ্বর ছিল। সুতরাং তাহাতে যখন কুসংস্কার আসিয়া পড়িল তখন তাহার মধ্যে যাহা কিছু সার ছিল তাহাও লোপ পাইয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল যে যদি অনৈসর্গিক ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে হইল এবং তান্ত্রিক ভোজবাজিকে সম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তাহা হইলে এই সকল ব্যাপার ভক্তিমূলক হইলেই মনকে তৃপ্ত করিতে পারে। আর নিরীশ্বর হইয়া সে সকলকে বিশ্বাস করিলে বিশ্বাসের বলও থাকে না এবং মুক্তির কোন উপায়ও থাকে না। এই জন্য প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যেন

মন স্বভাবতঃ ভক্তির দিকে দৌড়াইয়া গেল। নিরীশ্বর ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে করিতে পুরাণাদির পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এধর্ম্মে যদি ঈশ্বরতত্ত্ব থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় এখনও তাহার প্রাদুর্ভাব এ দেশে থাকিত। কিন্তু ঈশ্বরবাদ না থাকাতে ইহা ভক্তির প্রচণ্ড স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই।

ধর্ম্মপতনের দ্বিতীয় কারণ অদ্বৈতবাদের প্রাদুর্ভাব। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তির প্রচণ্ড উত্তাপে বৌদ্ধ তেজের হ্রাস হয়। সেই সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক উপস্থিত হইলে বৌদ্ধ আচার্য্যকেই পরাস্ত হইয়া মস্তক দান করিতে হইত। তৃতীয় কারণ রাজাদিগের আক্রোশ। মগধ দেশের রাজারা শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সমুদয় প্রদেশেই হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য ক্রমশঃ স্থাপিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে। হিন্দু রাজারা যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিতে লাগিলেন এবং যেখানে বৌদ্ধ বিহার ছিল সেইখানে সেই বিহার নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শিবের মন্দির স্থাপন করিতেন। কাশীতে যত মন্দির এখন বর্ত্তমান আছে তাহার কোনটাই বোধ হয় অধিক পুরাতন নহে। প্রায় সকলই বৌদ্ধধর্ম্মের পরে স্থাপিত। ইহাও বলা যাইতে পারে যে যত বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহাদিগের প্রস্তর ও ইষ্টক লইয়াই এখনকার মন্দির সকল নির্ম্মিত। কাশীতে এখনও একটি বাজার আছে তাহার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড বোধ হয় সরনাথ হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ কারণ মুসলমানদিগের দেশ অধিকার। যখন মুসলমানেরা এদেশ জয় করে তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম কাশী এবং মগধ প্রদেশে জীবিত ছিল। তাহাদিগের আগমনে বৌদ্ধ কীর্ত্তি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা একেবারে